জয় বাংলা

৭ই মার্চ ২০২৪

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু **শেখ মুজিবুর রহমান**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা** এমপি

জয় বাংলা

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৪ উদ্‌যাপন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টা
নাহিদ ইজাহার খান এমপি
প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা
খলিল আহমদ
সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদক
হাসনা জাহান খানম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
মুহম্মদ নূরুল হুদা
মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

সম্পাদনা পর্ষদ
মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোঃ মিজানুর রহমান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোহাঃ নায়েব আলী, সচিব, বাংলা একাডেমি
মিনার মনসুর, পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
আইরীন ফারজানা, উপসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শারাবান তাহুরা, উপসচিব (সংসদ ও আইন), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
রাজীব কুমার সরকার, উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
রাজীব কুমার সাহা, কর্মকর্তা, অভিধান ও বিশ্বকোষ উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি

প্রকাশনায়
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অক্ষরবিন্যাস
আশরাফুজ্জামান

কম্পিউটার গ্রাফিক ডিজাইন
মোঃ সাইফুল ইসলাম

মুদ্রক
মোঃ মনিরুজ্জামান
ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা ১০০০

প্রকাশকাল
২৩শে ফাল্গুন ১৪৩০/৭ই মার্চ ২০২৪
তৃতীয় সংকলন

সূচিপত্র

বাণী ১১-২২

সম্পাদকীয় ২৩-২৪

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ২৭-২৯

ভাইয়েরা আমার ৩০-৩২
শেখ হাসিনা

কবিতা

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো ৩৩-৩৪
নির্মলেন্দু গুণ

আমি ৭ই মার্চ ১৯৭১ ৩৫-৩৬
মুহম্মদ নূরুল হুদা

সেই তর্জনী ৩৭
মাসুদুজ্জামান

বিদ্রোহী এবং বিদ্রোহী ৩৮
ফারুক মাহমুদ

প্রতীক ৩৯
বিমল গুহ

তুমি প্রতিদিন পিতা ৪০
নাসির আহমেদ

একাত্তরের এক দিন ৪১
মোহাম্মদ সাদিক

মা, তোমাকে খুব মনে পড়ে ৪২-৪৪
মুহাম্মদ সামাদ

মার্চের আগুন ও অশুভের ছায়া ৪৫-৪৭
আসাদ মান্নান

এই এখানেই স্বাধীনতার ডাকে ৪৮
আসলাম সানী

রমনার রৌদ্রে কয়েকটি গাছের গ্রাফিক্স ৪৯
ঝর্না রহমান

বলো হে বাঙালি ৫০
মিনার মনসুর

নক্ষত্রের তর্জনী আজো ডাক দিয়ে যায় ৫১-৫২
আনিসুল হক

একটি কবিতা এবং দমিত মানুষের জেগে ওঠা ৫৩-৫৪
মনিরুস সালেহীন

৭ই মার্চ ৫৫
তারিক সুজাত

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

৭ই মার্চের ভাষণ ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা ৫৬-৭৩
মুনতাসীর মামুন

Bangabandhu's 7th March Speech on UNESCO's World Heritage List: A Social and Communicological Analysis ৭৪-৮৩
A A M S Arefin Siddique

৭ই মার্চ বাঙালির ইতিহাসের বাঁকবদলের দিন ৮৪-৮৮
ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

৭ই মার্চ ভাষণের সূত্র ও সুর ৮৯-৯১
সৌমিত্র শেখর

গল্প

মুজিবের হলদে পাখি ৯২-৯৮
সেলিনা হোসেন

স্বপ্না ৯৯-১০৪
আনোয়ারা সৈয়দ হক

শক্রবীজ ১০৫-১১০
মোহিত কামাল

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২৩শে ফাল্গুন ১৪৩০
৭ই মার্চ ২০২৪

বাণী

৭ই মার্চ বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' উপলক্ষ্যে আমি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

১৯৭১ সালের এই দিনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। পুরো বাঙালি জাতি সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো অবগাহন করেছিল রাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধুর অমর কবিতায়। মাত্র ১৮ মিনিটের এই মহাকাব্যে ধ্বনিত হয়েছিল বাঙালি জাতির মুক্তির মহামন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর শানিত ও প্রদীপ্ত উচ্চারণে কেঁপে উঠেছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের মসনদ। মূলত ৭ই মার্চের ভাষণেই নিপীড়িত-নির্যাতিত বাঙালি জাতি খুঁজে পেয়েছিল শোষণমুক্তির কাঙ্ক্ষিত পথ। তাই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির জন্য পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির মহাকাব্য।

স্বাধীনতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। তবে তা একদিনে অর্জিত হয়নি। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১-এর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিক-নির্দেশনা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১লা মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর ওই ভাষণে বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গেঁথে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ঐতিহাসিক সেই ভাষণের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। বাংলার মানুষের সাথে বঙ্গবন্ধুর আত্মার সম্পর্ক ছিল। তাই তাঁর ভাষণে মূলত মানুষের মনের কথাগুলো ফুটে উঠেছিল। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর এ ভাষণকে World's Documentary Heritage-এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাঙালি হিসেবে এটি আমাদের বড়ো অর্জন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল আমাদের নয় বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা'য় পরিণত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন। মহান এ নেতার সে স্বপ্ন পূরণে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

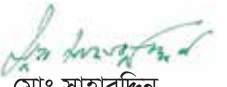

মোঃ সাহাবুদ্দিন

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩শে ফাল্গুন ১৪৩০
৭ই মার্চ ২০২৪

বাণী

৭ই মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। আমাদের মহান নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে একটি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধায় প্রথমেই স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ, দু'লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোন এবং অগণিত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে–যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা। পূর্ব বাংলার মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় এবং পৃথিবীর মানচিত্রে তাঁদের জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতির পিতা শেখ মুজিব পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছর লড়াই-সংগ্রাম করেছেন, জেল-জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন এবং সকল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। একমাত্র তিনিই ছিলেন হাজার বছরের শোষিত-বঞ্চিত বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু, পাকিস্তানিরা আওয়ামী লীগের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ না করে নানা টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি আমাদের 'স্বাধীনতা' নামের এক অমরবাণী শুনান এবং সংগ্রামের মাধ্যমে শৃঙ্খলমুক্তির পথ দেখান। তিনি বীর বাঙালিদের অবশ্যম্ভাবী বিজয়কে উৎকীর্ণ করেন তাঁর ভাষণের শেষ দুটি শব্দে 'জয় বাংলা' স্লোগানে।

রাজনীতির কালজয়ী মহাকবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই ভাষণের মাধ্যমে দেশের শাসনভার জনগণের হাতেই তুলে দেন; ক্ষমতাকে কী করে নিয়ন্ত্রিতভাবে সকলের কল্যাণে ব্যবহার করতে হয় তাও বুঝিয়ে দেন; শিখিয়ে দেন আত্মরক্ষামূলক কিংবা প্রতিরোধক সমরনীতি, যুদ্ধকালীন সরকার ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি। সেই মর্মস্পর্শী বজ্রনিনাদ ৭ কোটি বাঙালির হৃদয়কে বিদ্যুৎ গতিতে আবিষ্ট করেছিল। একটি ব্রিটিশ পত্রিকা বঙ্গবন্ধু ভবনকে ১০-ডাউনিং স্ট্রিটের সঙ্গে তুলনা করেছিল। ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে ঢাকায় রাষ্ট্রপতির বাসভবনে বাঙালি বাবুর্চি ইয়াহিয়া খানের জন্য রান্না বন্ধ করে দিয়েছিল। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত দেশের প্রতিটি মানুষ ইয়াহিয়ার শাসনকে অগ্রাহ্য করে

শেখ মুজিবের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। সেই রাতে পাকিস্তানি শাসক তাঁকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলার দামাল ছেলেরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে নয় মাস যুদ্ধ করে পাকিস্তানিদের বাংলার মাটিতে পরাস্ত করে ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনে।

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন এবং তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে একটি উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত করেন। দুর্ভাগ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের পরাজিত শত্রুদের এ দেশীয় দোসররা পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। তারা ৭ই মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ করে এবং 'জয় বাংলা' স্লোগানও নিষিদ্ধ করে। ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিবের নাম মুছে দিতে উদ্যত হয়।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর খুনি মোস্তাক-জিয়ার আনীত দায়মুক্তি অধ্যাদেশ বাতিল করে এবং জাতির পিতা হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু করে। পরবর্তীকালে আমরা ২০০৯ সাল থেকে পরপর তিন দফা সরকার গঠন করে জাতির পিতার আদর্শে দেশের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করি। জাতির পিতা হত্যার বিচারের রায় কার্যকরের মধ্যে দিয়ে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করি; ফলে জাতি গ্লানিমুক্তি হয়। আমরা সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন আইন, ২০১১ প্রণয়ন করে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে সংবিধানের ১৫০(২) অনুচ্ছেদের পঞ্চম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করি। ২০১৩ সালে Jacob F. Field প্রকাশিত ২৫০০ বছরের বিশ্বসেরা যুদ্ধকালীন ভাষণের সংকলন 'We Shall Fight on the Beaches : The Speeches That Inspired History'-এ এই ভাষণ অন্যতম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতিসংঘের ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর এ ভাষণকে 'বিশ্ব-ঐতিহ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। শুধু তাই নয়, ইউনেস্কো মনে করে এ ভাষণটির মাধ্যমে জাতির পিতা প্রকারান্তরেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বিশ্বস্বীকৃতি আজ বাঙালি জাতির জন্য এক বিরল সম্মান ও গৌরবের স্মারক। আমাদের হাইকোর্টের রায়ের উপর ভিত্তি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 'জয় বাংলা'-কে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

আমাদের সরকারের গৃহীত উদ্যোগের ফলে বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। ২০৪১ সালে দেশকে 'স্মার্ট বাংলাদেশে' রূপান্তরিত করব। আমি বিশ্বাস করি 'জয় বাংলা' স্লোগান এবং জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ যুগে-যুগে বাঙালিদের বিশ্বের বুকে আত্মমর্যাদার সাথে মাথা উচু করে চলতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা

২৩শে ফাল্গুন ১৪৩০
৭ই মার্চ ২০২৪

বাণী

মার্চ বাঙালির ইতিহাসের চূড়ান্ত বাঁকবদলের মাস। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালির আরাধ্য মানুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী জনতার উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। অবিস্মরণীয় এই দিনটিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযথ মর্যাদায় পালনের অংশ হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'জয় বাংলা' শিরোনামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন রেসকোর্স মাঠের মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন, সেই বিকেলে কিছু সময়ের জন্য থমকে গিয়েছিল সারা দেশ–তারপর একে একে উনিশ মিনিটের বজ্রনির্ঘোষে তিনি যা বললেন তাতে বদলে গেল বাংলার ইতিহাসের গতিপথ। তাঁর বক্তৃতার প্রতিটি বাক্য ছিল মহাকাব্যের একেকটি অধ্যায়। এতকাল বাঙালি স্বাধিকার ও স্বশাসনের যে স্বপ্ন লালন করেছে, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মতো সেখানে আছড়ে পড়লো স্বাধীনতার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করলো কীভাবে বজ্রকণ্ঠ ও একটি তর্জনী একসূত্রে গেঁথে ফেলেছে সর্বকালের বাঙালিকে। কীভাবে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে সঞ্চারিত হলো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়।

এই ভাষণের তাৎপর্য, ব্যাপ্তি ও মহিমা আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। এ ভাষণে ইতিহাস, চেতনা, আত্মত্যাগ, স্বাধীনতার আহ্বান ও যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল এক সূত্রে গাঁথা। পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার ভাষণ এটি এবং সেইসঙ্গে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ ভাষণ। এই ভাষণ পৃথিবীর ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অভিষিক্ত করেছে Poet of Politics বা রাজনীতির কবির মর্যাদায়। ২০১৭ সালে ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য (World's Documentary Heritage)-এর অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে Memory of the World International Register-এ তালিকাভুক্ত করেছে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতা আহ্বানের পাশাপাশি উচ্চারিত ছিল সমৃদ্ধ, ক্ষুধা, ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে আজ সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুকন্যার এই আত্মপ্রত্যয়ী যাত্রায় ৭ই মার্চের ভাষণ আমাদের চিরকালীন প্রেরণা।

এই স্মরণিকা প্রকাশে যারা কাজ করেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

নাহিদ ইজাহার খান এমপি
প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩শে ফাল্গুন ১৪৩০
৭ই মার্চ ২০২৪

বাণী

আজ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ। আমি এ মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে পরম শ্রদ্ধায় প্রথমেই স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণদানকারী তিরিশ লাখ শহিদ, যাঁদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে লাল-সবুজের এই বাংলাদেশ; অগণন বীর মুক্তিযোদ্ধা, তিন লাখ বীরাঙ্গনা মা-বোনকেও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের এই দিনে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান অর্থাৎ বর্তমানের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে রচনা করেছিলেন ১৮ মিনিটের এ মহাকাব্য।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। জাতির পিতার এই ঐতিহাসিক ভাষণ আজ জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত 'বিশ্ব-ঐতিহ্য দলিল'। ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর অনন্য এ স্বীকৃতি প্রদান করে। এ স্বীকৃতি বাঙালি জাতির জন্য বয়ে এনেছে এক অভূতপূর্ব ও বিরল সম্মান। ইউনেস্কোর এ স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে জাতির পিতার ৭ই মার্চের এই উদ্দীপক ভাষণই যে বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল এটি সর্বাগ্রে প্রতিভাত হয়েছে।

বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশধারার সঙ্গে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের প্রণীত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নীতির দ্বন্দ্ব-সংঘাত-অভিঘাতের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালিদের মনে যে নতুন জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হয় তারই ফলে গড়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন। আর এই আন্দোলনের অগ্রণীপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৭ই মার্চের ভাষণই ছিল স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে জাতীয় মুক্তি তথা স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে বঙ্গবন্ধুর লড়াইয়ের চূড়ান্ত আহ্বান। এ ভাষণ প্রকৃত অর্থেই ছিল বাঙালির স্বাধীনতার ঘোষণা। বাঙালির জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে হাজার বছর ধরে লালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আন্দোলন-সংগ্রাম, স্বপ্ন ও স্বপ্ন রূপায়ণের এক মহাকাব্য এ ভাষণ। দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জাতির পিতা সেদিন এক কৌশলী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন; তিনি তাঁর ভাষণে আলোচনার পথ খোলা রেখেও কৌশলে স্বাধীনতার

ডাকই দিয়েছিলেন। উপস্থিত মুক্তিকামী লাখো জনতা সেদিন বঙ্গবন্ধুর ইঙ্গিত বুঝে পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। যার প্রত্যক্ষ ফল নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত লাল-সবুজের বাংলাদেশ।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৪ উদ্‌যাপনের এ লগ্নে আজ আমাদের বিশেষ দায়িত্ব এই ঐতিহাসিক ভাষণের মর্মার্থ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের যে আহ্বানে বাঙালি জাতি পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে সেই আহ্বানে এবং জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই আমরা তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বাস্তবে রূপ দিতে চাই। আসুন, সম্মিলিত উদ্যোগে দেশগঠনে আমরা ব্রতী হই।

আমি ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নাহিদ ইজাহার খান

নাহিদ ইজাহার খান এমপি

আসাদুজ্জামান নূর এমপি
সভাপতি
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

২৩শে ফাল্গুন ১৪৩০
৭ই মার্চ ২০২৪

বাণী

বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে ইতিহাসের ১৯৭১-এর মার্চ এক উত্তাল পর্ব। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ বজ্রকণ্ঠে রচনা করেন এক মহাকাব্য। সেই মহাকাব্যিক ভাষণ প্রদানের ঐতিহাসিক দিন ৭ই মার্চ, এখন আর শুধু আমাদের জাতীয় জীবনে নয়, বিশ্ব-ইতিহাসেও এক মহিমান্বিত দিন। বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ আজ জাতিসংঘের ইউনেস্কো স্বীকৃত 'বিশ্ব-ঐতিহ্য দলিল'। ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর ইউনেস্কো এ স্বীকৃতি প্রদান করে। এ স্বীকৃতি বাঙালি জাতির জন্যে এক বিরল সম্মান ও গৌরবের স্মারক।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপনের মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি গভীর শ্রদ্ধায় প্রথমেই স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণদানকারী ত্রিশ লক্ষ শহিদ, যাঁদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে এই বাংলাদেশ; আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি অগণন বীর মুক্তিযোদ্ধা, দুই লক্ষ বীরাঙ্গনা মা-বোনকেও।

৭ই মার্চের ভাষণ ছিল স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের লড়াই-সংগ্রামের চূড়ান্ত আহ্বান। এই ভাষণে ছিল আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্ণ দিক-নির্দেশনা। এ ভাষণ প্রকৃত অর্থেই ছিল বাঙালির স্বাধীনতার ঘোষণা। বাঙালির জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে হাজার বছর ধরে লালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আন্দোলন-সংগ্রাম, স্বপ্ন ও স্বপ্ন রূপায়ণের এক মহাকাব্য এই ভাষণ। দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু সেদিন এক কৌশলী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে আলোচনার পথ খোলা রেখেও কৌশলে স্বাধীনতার ডাকই দিয়েছিলেন। উপস্থিত মুক্তিকামী লাখো জনতা সেদিন বঙ্গবন্ধুর ইঙ্গিত বুঝে পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। যার প্রত্যক্ষ ফল নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন লাল-সবুজের বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের মর্মার্থ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে স্মরণিকা প্রকাশ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আমি এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান নূর এমপি

খলিল আহমদ
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩শে ফাল্গুন ১৪৩০
৭ই মার্চ ২০২৪

বাণী

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মুক্তির মহানায়ক। তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ আমাদের মুক্তির মহামন্ত্র। বিনম্র চিত্তে স্মরণ করছি সেইসব বীর শহিদদের যাঁরা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জীবনের সকল মায়া ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামে, বুকের তাজা রক্তে এঁকেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র।

একটি ভাষণ যে কখনো কখনো একটি জাতির বীরত্বের পরিচায়ক হয়ে ওঠে তার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ। এ ভাষণ পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের দীর্ঘ ২৩ বছরের অবিচার, অনাচার, শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত আগুন; যে আগুন ছড়িয়ে গিয়েছিল সবখানে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সেদিন শুধু রেসকোর্স ময়দানের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসমুদ্রকে উত্তাল করেনি, প্রকম্পিত করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকের সিংহাসন, জাগরণ সৃষ্টি করেছিল বিশ্ববিবেকের। আমাদের মুক্তির সংগ্রামকে বঙ্গবন্ধু যুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এ ভাষণের মধ্য দিয়ে। তাঁর ভাষণে স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন, সার্বভৌমত্বের দাবিগুলো উঠে এসেছিল ন্যায্যতার ভিত্তিতে। মূলত ৭ই মার্চের ভাষণের ভিত্তিতেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বমত সৃষ্টি হয়েছিল।

একথা সর্বস্বীকৃত যে, বঙ্গবন্ধু বাংলার প্রতিটি মানুষকে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করতেন। প্রত্যেক বাঙালি-জীবনকে নিজের জীবন মনে করতেন। তাইতো আমাদের ওপরে পাকিস্তানি জান্তাদের হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে তিনি বলেছিলেন, "...আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।" বঙ্গবন্ধুর বেদনার্ত হৃদয়ের কথাগুলো সেদিন ক্রোধের আগ্নেয়গিরির মতো ধাবিত হয়েছে শোষকশ্রেণির দিকে, আবার প্রাণস্পর্শী হয়ে আন্দোলিত করেছে মুক্তিপাগল জনগণকে। ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল

অর্গানাইজেশন (ইউনেস্কো) ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য পর্যালোচনার ভিত্তিতে এ ভাষণকে World's Documentary Heritage-এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ স্বীকৃতি আমাদের বৈশ্বিক গৌরব ও মর্যাদাকে আরও সমুন্নত করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন যেমন দেখতেন, ঠিক তেমনই দেখতেন একটি শান্তিপূর্ণ ও মানবিক বিশ্বের স্বপ্ন। তাঁকে বিশ্ববন্ধু বললে কোনোভাবেই অত্যুক্তি হবে না।

বাংলাদেশ আজ জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি-এর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'রূপকল্প ২০৪১' ও 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর অপ্রতিরোধ্য নির্মাণযাত্রায় সুযোগ্য সারথি হতে সকলকে আমি আহ্বান জানাই। প্রত্যাশা করি, আমাদের মুক্তির প্রতিধ্বনি 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৪' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল উদ্যোগ ও আয়োজন সফল হোক।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

খলিল আহমদ

সম্পাদকীয়

৭ই মার্চ বাঙালি জাতির চূড়ান্ত মুক্তির সনদ। এই ঐতিহাসিক দিনে জাতির পিতার প্রদত্ত ভাষণই আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নসোপান। ১৯৭১ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার সমাবেশে বজ্রকণ্ঠে রচনা করেছিলেন ১৮ মিনিটের এক অনলবর্ষী মহাকাব্য। সেই মহাকাব্য তথা ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক-নির্দেশনামূলক আহ্বান। স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালি জাতির জন্য তা ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের শৃঙ্খল ছিন্ন করে জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাক। এটি ছিল জাতির পিতার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার অন্যতম পরিচায়ক। এ দূরদর্শী ভাষণের মাধ্যমেই তিনি বিশ্বখ্যাত 'নিউজউইক' ম্যাগাজিন (১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল সংখ্যা) কর্তৃক আখ্যায়িত হন 'পোয়েট অব পলিটিলক্স' বা 'রাজনীতির কবি' হিসেবে।

৭ই মার্চ কেবল আমাদের জাতীয় জীবনে নয়, বিশ্ব-ইতিহাসেও এক অবিস্মরণীয় দিন। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ১৯৭১-এর সময়ের ইতিহাস হয়ে সেই সময়েই বিশ্বসম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক মাত্রা লাভ করেছিল। তখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ভাষণের অনুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশিত হয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে ভাষণটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ আজ জাতিসংঘের ইউনেস্কো স্বীকৃত 'বিশ্ব-ঐতিহ্য দলিল'। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর এ ভাষণকে World's Documentary Heritage-এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই অর্জন সমগ্র বাঙালি জাতিকে গৌরবান্বিত করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রায় সকল বক্তৃতাই বক্তব্যের স্পষ্টতা, বাচনভঙ্গির ওজস্বিতা এবং অভিঘাতের গভীরতায় ঋদ্ধ। এর মধ্যে ১৯৭১ সালের ৭ই

মার্চের বক্তৃতা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই বক্তৃতা শ্রবণে আলোড়িত ও শিহরিত হয় দেহ-মন। আবেগ এবং যুক্তির এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণে এ বক্তৃতা হয়ে উঠেছে কালজয়ী। সে হিসেবে ৭ই মার্চের বক্তৃতা আমাদের অমূল্য উত্তরাধিকার যার গৌরব অনুভূত হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সাল থেকে সারা দেশে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ধারাবাহিকতায় এ বছরও 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৪' জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় অনুষ্ঠানমালার পাশাপাশি 'জয় বাংলা' শিরোনামে স্মরণিকা তৃতীয়বারে মতো প্রকাশ করা হলো।

এ স্মরণিকায় দেশের স্বনামধন্য কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষকবৃন্দের প্রবন্ধ, গল্প এবং কবিতা সংকলিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন রয়েছে সংকলিত লেখাসমূহে। মূল্যবান লেখার জন্য তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয় বাণী দিয়ে স্মরণিকাটিকে ঋদ্ধ করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

'জয় বাংলা' স্মরণিকা সম্পাদনকর্মের সঙ্গে যুক্ত সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাসনা জাহান খানম
সম্পাদক
ও
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

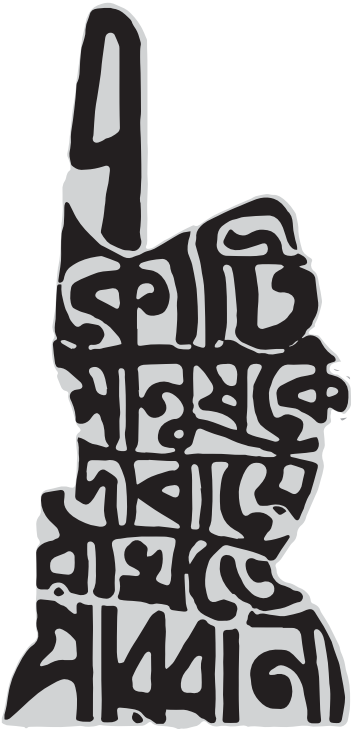
১ কোটি
মানুষকে
একসাথে
রাখতে
পারবানা

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়–আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান 'মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন–দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো–এমনকি আমি এও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম–আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো। তিনি বললেন পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি

কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে–তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু–আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের আরটিসি, কার সাথে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসবো? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহিদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি,

আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে–শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়–তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল–প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু–আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো–কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়–হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেওয়া-নেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা!

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে, ৭ই মার্চ ১৯৭১

ভাইয়েরা আমার
শেখ হাসিনা

রেসকোর্স ময়দান। সকাল থেকেই দলে দলে লোক ছুটছে ময়দানের দিকে। গ্রামবাংলা থেকে মানুষ রওয়ানা দিয়েছে ঢাকার পথে। সকাল দশটা-এগারোটার মধ্যেই আমরা শুনতে পারলাম, ময়দানে লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে। একটা মঞ্চ তৈরি হচ্ছে, খুবই সাদাসিধে মঞ্চ। মাথার উপর কোনও চাঁদোয়া নাই, শুধু একটা খোলা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিম দিকে মুখ করে মঞ্চটা তৈরি। পূর্ব দিকে রাস্তার পাশ থেকে একটা সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। মাঠ জুড়ে বাঁশ পুঁতে পুঁতে মাইকের হর্ন লাগানো হচ্ছে। যতই মানুষ বাড়ছে, ততই হর্ন লাগানো হচ্ছে। মাইক যাঁরা লাগাচ্ছেন, তাঁরাও যেন হিমশিম খাচ্ছেন, কোনও কূলকিনারা পাচ্ছেন না। কত মানুষ হবে? মানুষ বাড়ছে আর তাঁরা তার টানিয়ে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ভলান্টিয়াররা খুবই তৎপর। মানুষের মাঝে প্রচণ্ড এক আকাঙ্ক্ষা, শোনার অপেক্ষা, কী কথা শুনাবেন নেতা। যাঁরা আসছেন, তাঁদের হাতে বাঁশের লাঠি, নৌকার বৈঠা ও লগি। তাঁদের মুখে-চোখে একই আকাঙ্ক্ষা-স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা। দীর্ঘ তেইশ বছরের শোষণ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এ মানুষগুলোর মুখে-চোখে। এ ময়দানে শরিক হয়েছে সর্বস্তরের মানুষ–নারী, পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-শিক্ষক, কিষান-কিষানি, জেলে, কামার, কুমোর, তাঁতি, রিকশাওয়ালা, নৌকার মাঝি, শ্রমিক–কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ ঘরে নেই।

ঢাকা শহরে এত মানুষ কোথা থেকে এলো? এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য, বিস্ময়কর চিত্র।

ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ি। মিরপুর রোড থেকে প্রবেশ করলে অর্থাৎ, পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে গেলে পঞ্চম বাড়িটি। এ বাড়িতেই বাস করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে বাড়িটিও লোকে লোকারণ্য। সড়কে মানুষের ঢল। লেকের পাড়ে সড়ক, তার পাশে বাসা। ছোটো বাসা। নিচতলা থেকে দোতলা পর্যন্ত নেতা-কর্মীদের আনাগোনা। এ ছাড়াও শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, ছাত্রনেতারা একের পর এক আসছেন। সকলেই ব্যস্ত নেতা শেখ মুজিব আজ কী বক্তব্য দিবেন, তা জানার জন্য। সকলে যাঁর যাঁর মতামত দিয়ে যাচ্ছেন। অনেকে লেখা কাগজ দিচ্ছেন। আজকের এই সমাবেশে কী ভাষণ দেওয়া উচিত তা নিয়েও আলোচনা করছেন। কোনও কোনও ছাত্রনেতা একথাও বলছেন, "আজকেই সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন–আমরা প্রস্তুত।" আরও বলছেন, "এটা যদি না বলেন মানুষ হতাশ হয়ে যাবে।" খুবই উত্তেজিত তাঁরা।

রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের মন্তব্য দিচ্ছেন। লিখিত কাগজ তো এত পরিমাণে জমে গেল যে, তা প্রায় বস্তা ভরে যাবে।

নিচের অফিসঘর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উপরে দোতলায় এলেন। আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা এক কাপ চা লেবুর দু'ফোঁটা রস দিয়ে আব্বার হাতে তুলে

দিলেন। বললেন, "তুমি এখানে বস, চা খাও, খাবার প্রস্তুত করছি।" সেখানে আমাদের অনেক নেতা উঠে এসেছেন, আত্মীয়স্বজন আছেন, ছাত্রনেতারাও আসছেন-যাচ্ছেন।

সময় প্রায় হয়ে এলো। মা টেবিলে খাবার দিলেন। বেশি কিছু আহামরি খাবার নয়, বাঙালির সাধারণ যে খাবার–ভর্তা, সবজি, ভাজা মাছ, মাছের ঝোল।

তিনি খেলেন। সঙ্গে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও খেলেন। সাথে বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা চলছেই। খাওয়া শেষ হলে মা সকলকে বললেন, "আপনারা এখন মাঠে চলে যান।"

আব্বাকে মা ঘরে যেতে বললেন। পাশের ঘরটা শোওয়ার ঘর। আমি আর আব্বা ঘরে গেলে মা বললেন, "তুমি একটু বিশ্রাম নাও।" আব্বা বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমি আব্বার মাথার কাছে বসে আব্বার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। এটা আমার সবসময়ের অভ্যাস। মা একটা মোড়া টেনে বসলেন। হাতে পানের বাটা। পান বানিয়ে আব্বার হাতে দিলেন। তারপর তিনি বললেন,

"দেখো, তুমি সারাটা জীবন এ দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছ, দেশের মানুষের জন্য কী করতে হবে তা সকলের চেয়ে তুমিই ভালো জানো। আজকে যে মানুষ এসেছে, তারা তোমার কথাই শুনতে এসেছে। তোমার কারও কথা শোনার প্রয়োজন নেই, তোমার মনে যে কথা আছে তুমি সেই কথাই বলবে। আর সেই কথাই সঠিক কথা হবে। অন্য কারও কথায় তুমি কান দেবে না।"

আব্বা কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকলেন।

সভায় যাওয়ার সময় আগত। তিনি প্রস্তুত হয়ে রওয়ানা হলেন।

আমরাও অন্য একটা গাড়িতে মাঠে পৌঁছলাম। মা বাড়িতেই থাকলেন।

রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছে তিনি দৃপ্ত পায়ে মঞ্চে উঠলেন। একনজর তাকালেন উত্তাল জনসমুদ্রের দিকে। তারপর বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠলেন :

"ভাইয়েরা আমার..."

এ ঐতিহাসিক ভাষণ যখন তিনি দেন, তাঁর হাতে কোনও কাগজ ছিল না, ছিল না কোনও নোট। চোখের চশমাটা খুলে টেবিলে রেখে তিনি ভাষণটা দিলেন, ঠিক যে কথা তাঁর মনে এসেছিল, সে কথাগুলোই তিনি বলেছিলেন। বাংলার মানুষের মনে প্রতিটি কথা গেঁথে গিয়েছিল। 'স্বাধীনতা', এ শব্দটা বুকে ধারণ করে তিনি যে-নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তা দেশের মুক্তিকামী মানুষ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে বিজয় অর্জন করেছিল। শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছর পার হয়েছে। এ ভাষণের আবেদন এখনও অটুট রয়েছে। পৃথিবীর কোনও ভাষণ এত দীর্ঘ সময় আবেদন ধরে রাখতে পারেনি। এই সাতচল্লিশ বছর ধরে এই ভাষণ কতবার এবং কত জায়গায় বাজানো হয়েছে, কত মানুষ শুনেছে তা কি কখনও হিসেব করা গেছে? যায়নি। প্রতিবছর ৭ই মার্চ ভাষণ বাজানো হচ্ছে ঢাকা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসগুলোতে মানুষ এ ভাষণ শোনে, প্রেরণা পায়।

তবে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করে সামরিক শাসন জারি করা হয়, মিলিটারি ডিক্টেটর

ক্ষমতা দখল করে, তখন এ ভাষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

তারপরও মুজিব ভক্ত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা থেমে থাকেনি। এ ভাষণ বাজাতে গিয়ে অনেকে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, কিন্তু তারপরও এ ভাষণ তারা বাজিয়েছে, শুনেছে।

যে ভাষণ মুক্তিযুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রেরণা ছিল, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বজ্রকণ্ঠের এ ভাষণ মানুষের মাঝে শক্তি জুগিয়েছিল, রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দিয়েছিল, সে ভাষণ ছিল নিষিদ্ধ।

১৯৭৫ সালের পর ২১ বছর সময় লেগেছে এ ভাষণ জনগণের সামনে সরকারিভাবে প্রচার করার জন্য। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আসার পর সরকারি গণমাধ্যমে এই ভাষণ প্রচার শুরু হয়।

আজ এ ভাষণ ডকুমেন্টারি হেরিটেজ বা বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘের ইউনেস্কো তার 'মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বি এন আহুজা সম্পাদিত 'দ্য ওয়ার্ল্ডস গ্রেট স্পিচেস' শীর্ষক রেফারেন্স বইয়ে এই ভাষণ স্থান পেয়েছে। লেখক ও ইতিহাসবিদ জেকব এফ. ফিল্ড-এর বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা 'উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস : দ্য স্পিচেস দ্যাট ইনস্পায়ার্ড হিস্টরি' গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ।

বিশ্বের বিখ্যাত যত ভাষণ বিশ্বনেতারা দিয়েছেন, সবই ছিল লিখিত, পূর্ব প্রস্তুতকৃত ভাষণ। আর ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত, উপস্থিত বক্তৃতা। এই ভাষণ ছিল একজন নেতার দীর্ঘ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা। একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি। যে যুদ্ধ এনে দিয়েছে বিজয়। বিজয়ের রূপরেখা ছিল এ বক্তৃতায়–যা সাত কোটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ছিল ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা।

> 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো', 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না', 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। 'জয় বাংলা'।

গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল ছিল এ ভাষণে। পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা প্রস্তুত রেখেছিল তাদের সমরাস্ত্র। কী বলেন শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে, সেটা শুনেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে এই ময়দানে, এয়ার অ্যাটাক করবে এবং গুলি করে সমবেত মানুষকে হত্যা করে তাঁদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে।

কিন্তু ৭ই মার্চের ভাষণের রণকৌশলে বাঙালি জাতি আশ্বস্ত হয়ে সকল প্রস্তুতি নিতে ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রাম-বাংলায়, প্রস্তুতি নিয়েছিল যুদ্ধের। প্রতিটি ঘরই পরিণত হয়েছিল এক-একটি দুর্গে। প্রতিটি মানুষ হয়েছিল এক-একজন যোদ্ধা। আর এই ভাষণ ছিল সকল প্রেরণার উৎস। আর সে কারণেই এত দ্রুত বাঙালি বিজয় অর্জন করেছিল।

আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের মিত্র শক্তিদের, যারা সে সময় দাঁড়িয়েছিল আমাদের পাশে।

১৭ই মার্চ ২০১৯

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

নির্মলেন্দু গুণ

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে : 'কখন আসবে কবি?'

এই শিশুপার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুল শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তা হলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি?
তা হলে কেমন ছিল শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?

জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত
কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ...।

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেদিন এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান, –এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখণ্ড অখণ্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু-ধু মাঠ ছিল দূর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতাপ্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু-ধু মাঠের সবুজে।

কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক।
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্ন মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানি, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা, ভবঘুরে
আর তোমাদের মতো শিশু পাতা-কুড়ানিরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্য কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের : 'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি?'

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি :
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

আমি ৭ই মার্চ ১৯৭১
মুহম্মদ নূরুল হুদা

আমি ৭ই মার্চ উনিশশ' একাত্তর।
এই মরলোক যদিও আমার আঁতুড়ঘর,
অনন্তকালের অনন্তলোকে আমি অনন্ত-অমর।
আমার মানব-উৎস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর।

ব্যক্তি তিনি, বাঙালির জাতির জনক,
তিনি রক্ষা করেছেন তাঁর গোত্রসমষ্টির হক;
জাতিমুক্তির পাঠ নিয়ে তিনি
বিশ্বকে দিয়েছেন মানবমুক্তির সবক।
স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়?
মুক্তপৃথিবীর মুক্তমানুষ আজ অবাক তাকায়
জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের লালসবুজ পতাকায়।

গণতন্ত্র কারো মনতন্ত্র নয়,
জাতিসত্তার নিশ্চয়তাই মানবসত্তার জয়;
সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রীতির নাম মানবকান্তি;
সাম্যবাদী সুবণ্টনেই প্রত্যাসন্ন বিশ্বশান্তি।

মুক্তি মানে ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি
শোষণ, অসাম্য ও আধিপত্য নয় মানবমঙ্গলের যুক্তি।
৭ই মার্চের মুক্তমঞ্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা,
বিশ্বব্যাপী জাতিরাষ্ট্রের শৃঙ্খলমুক্তির প্রমিত প্রণোদনা।

৭ই মার্চের সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী মানবতার মুক্তি সংগ্রাম,
৭ই মার্চের সংগ্রাম সকল জাতিরাষ্ট্রের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

আমি ৭ই মার্চ। আমি নই শুধু দিন বা ক্ষণ।
আমি চিরঅক্ষয় এই মহাবিশ্বের নিত্যবিবর্তন,
আর তার প্রাণী ও প্রাণসত্তার মুক্তির প্রতীক
মহাকালের মহাঘড়ি, আমি বেজে চলেছি টিকটিক।

আমি জয় বাংলা, বাংলার জয়;
আমি মহাবিশ্বের মহামানবের মহাকালের
জয় সুনিশ্চয়, জয় শুভসময়।

সেই তর্জনী

মাসুদুজ্জামান

পৃথিবীতে কত কিছুই তো আছে
একদিন কোনো এক জনপদে
সবার ঘুম ভেঙে গেল

একজন দেবদূত তাঁর তর্জনী দিয়ে
একটা ফুল আঁকলেন
ধরণিতে যত ফুল ছিল প্রস্ফুটিত হলো

তর্জনীর ইশারা বুঝে নিলো যত পাখি
মুক্তির আনন্দে তারা আকাশে
ডানা ঝাপটে উড়তে থাকল

নদী ও সমুদ্র ছিল ঈষৎ কল্লোলিত
তারাও তর্জনীর ইশারায় ফুঁসে উঠল

বাঘেরা ছিল অরণ্যের গভীরে মন্থর
তাদেরও ঘুম ভেঙে গেল
মানুষকে তারা দিলো বরাভয়

মানুষটি এবার তর্জনী দিয়ে একটা
রক্তজবা ফোটালেন
সবুজ তৃণের উপরে ফুটে উঠল
একটা মানচিত্র।

বিদ্রোহী এবং বিদ্রোহী

ফারুক মাহমুদ

এমনটি এর আগে বাংলা ভাষা কখনো দেখেনি
এমনটি এর আগে বিশ্বভাষা কখনো দেখেনি

লেখার নতুন ভঙ্গি, শব্দগুলো যথেষ্ট আগুন
ছন্দের বুনট তীব্র, উপমায় পুরাণের দ্যুতি
এত ঋজু, এত স্পষ্ট, শিল্পচিহ্ন মধ্যঅন্ত্যমিলে
শব্দের উচ্চতা গেছে আকাশের ত্রিসীমানায়
শব্দের হুংকার গেছে বাতাসের সব উচ্চারণে
ভীতিবেষ্টিত চোখের প্রান্তে
'তাতা-থইথই' ঝড়োরুদ্ররেখা

একটি কবিতা লিখে নজরুল হলেন
বিদ্রোহের প্রদীপ্ত প্রতীক

একাত্তরের সাতই মার্চ
শোভন গর্জন আর তর্জনীর বিপুল তরঙ্গে
বঙ্গবন্ধু শোনালেন তাঁর কবিতা-ভাষণ-বাণী

উনিশশ' একুশ সালে রচিত
'বিদ্রোহী' কবিতাটিই ফিরে এলো একাত্তর সালে

প্রতীক
বিমল গুহ

দিগন্ত তোলপাড় করে একদিন
মহাঘূর্ণি নেমে এসেছিল বাংলায়।
কপট-শৃঙ্খলরেখা বালির বাঁধের মতো ভেসে গিয়েছিল
মধ্যদুপুরে;
অসম বন্ধন ছিন্ন করে মানুষের মাঝে ছুটে গিয়েছে তখন
বাংলার মুক্তিদূত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান;
আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে উঠেছিল
স্বাধীনতার মন্ত্রবীজ ৬-দফা
মানুষের মুষ্টিবদ্ধ হাতে পৌঁছে দিয়েছে সেদিন দৃঢ় স্পর্ধায়।
জীবন-মৃত্যুর মুখে আমাদের দাঁড়াতে হয়েছে সেদিন
যেন ঘূর্ণির তোড়ে বেসামাল সময়-যাপন!

মুক্তির বার্তা নিয়ে বঙ্গবন্ধু এগিয়ে গেলেন সম্মুখে
বীরদর্পে দৃঢ় পদক্ষেপে দূর-পথে।
দীপ্র সাহস নিয়ে অবিচল এগোয় সময়
মুক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত দুরন্ত কিশোর শোনে তর্জনীর ভাষা
বজ্রকণ্ঠ ডাক
মানুষের মুখে মুখে 'জয় বাংলা' ধ্বনি বারংবার
প্রকম্পিত হয়
সবকিছু তুচ্ছ করে পুবাকাশে জেগে ওঠে
রক্তলাল ভোর–আমাদের প্রথম সকাল;
সেই
তর্জনী উঁচানো হাত বাঙালির মুক্তির প্রতীক এখন।

তুমি প্রতিদিন পিতা
নাসির আহমেদ

তোমার প্রতিটি দিন মানুষের সান্নিধ্যে উজ্জ্বল
কোটি কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষা তোমাকে ছুঁয়েছিল
মানুষের কষ্টে তাই তোমার দুচোখ ছলছল
বাংলার প্রতিটি নদী তোমার চরণে ছুঁয়েছিল।

তোমার কৈশোর জুড়ে স্বপ্ন ছিল দেশ-স্বাধীনতা
উন্মুক্ত মাঠের মতো প্রতিটি কিশোর হবে সুখী
শিশুদের মুখে আর থাকবে না ক্ষুধার দীনতা
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তুমি অন্ধকারে একা সূর্যমুখী!

বাংলার মানুষ হবে সুখে তৃপ্ত দুঃখতাপহীন
সেই স্বপ্নে দেশভাগে উজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছিলে
শুরুতেই বুঝেছিলে সেই স্বাধীনতা অর্থহীন
বাঙালির ঘরে ঘরে সেই দুঃসংবাদও তুমি দিলে!

তারপর থেকে শুরু চরম দুঃখের পথ চলা
মাতৃভাষা কেড়ে নিতে চাইলে করেছ প্রতিরোধ
স্বাধিকার চেয়ে নিত্য দ্রোহের আগুনে তীব্র-জ্বালা
বাঙালির মনে তুমি জাগালে সাহস আর ক্রোধ!

তুমি মানে সাতই মার্চ, তুমিই তো মুক্তি-স্বাধীনতা
বজ্রকণ্ঠ বাঙালির অমিতসাহসী কথকতা।

একাত্তরের এক দিন
মোহাম্মদ সাদিক

সাত মার্চের সেই ভাষণ শোনার জন্য তিন ব্যান্ডের
ফিলিপস রেডিওতে কান পেতে বসেছিলাম আমরা
কিন্তু ভাষণ শুনতে পাই না
এবং উদ্বেগাকূল দিন, রাত, প্রহর যায়
অবশেষে সেই বজ্রকণ্ঠ বাণী ভেসে আসে
শত সমুদ্রের গর্জন হয়ে–'আর যদি একটা গুলি
চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা
হয়...' এবং তিনি বললেন–
'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল'
এবং আমরা বুঝতে পারি–একটি যুদ্ধের জন্য
তিনি প্রস্তুতি নিতে বলেছেন–
ধাড়ারগাঁয়ের দিগন্তে দাঁড়িয়ে দেখি–
আকাশ নীল–এবং আরও বেশি গাঢ় নীল
হয়ে আছে! উঠোনে শুকোতে দেয়া
মার শাড়ি–বাতাসের ঝাপটায় ছিঁড়ে যায়!
আমাদের সুরমা নদীতে একটি নৌকা–ঘাট থেকে
খুলে গিয়ে একাকী ভাসে
চারদিকে কোনো পাখি নাই, কান্না নাই
রোদ ঝলমল দেশে কোনো শব্দ নাই

তিন ব্যান্ডের ফিলিপস রেডিওতে সমুদ্রের গর্জন
শোনা যায়–
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!'
তিন ব্যান্ডের ফিলিপস
রেডিওটি ঘিরে আমরা যারা বসেছিলাম–
আমাদের স্বপ্নের কথা শুনতে শুনতে আমরা কাঁদতে থাকি।

মা, তোমাকে খুব মনে পড়ে

(বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব স্মরণে)

মুহাম্মদ সামাদ

আমাদের তীর্থভূমি টুঙ্গিপাড়ার আদুরে কন্যা তুমি।
কাশফুলে শাপলায় বকুলের গন্ধে রূপসি ঘুঘুর গানে
কান্তিমান মুজিবের ভালোবাসার বৈভবে
তোমার সংসারযাত্রা অবুঝ শৈশবে।
তোমার ভালোবাসায় মুজিব এগিয়ে গেছে অভীষ্ট গন্তব্যে;
সেই থেকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির সহযাত্রী হয়ে
জীবনের পথে পথে প্রিয় বাংলার সবুজের সমারোহে
বৃক্ষে ঘাসে ইতিহাসে কত শত ফুল তুমি ফুটিয়েছো।
মা, তোমাকে খুব মনে পড়ে...

আটপৌরে তোমার তাঁতের শাড়ি, কালো পশমি চাদর;
পাকঘরের তৈজসপত্র, বসার বেতের মোড়া;
তোমার সুগন্ধী জর্দা, জাফরানি পাতি–
কারুকাজখচিত পানের রেকাবি; শুভের কাজলদানি;
ঘনচুলে জবাকুসুম তেলের সুরভিত ঘ্রাণ;
আর ধীর স্থির নিরাভরণ তোমার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে
কী রাজসিক সারল্য মাগো!

দীর্ঘ সংগ্রামে খুলে গেছে তোমার কণ্ঠের চন্দ্রহার
তিলে তিলে জমানো সঞ্চয় আর সমুদয় স্বর্ণালংকার;
প্রিয় মুজিবের নিঃসঙ্গ বন্দি জীবনের যাতনার সহমর্মী হয়ে
জেলগেটে পৌঁছে দেয়া তোমার খাতার পর খাতা
বাঙালির অনুপম মহাকাব্য হয়ে ইতিহাসের নতুন পাতা
ভরিয়ে তুলেছে লাল নীল সাদা ও গোলাপি ফুলের সম্ভারে;
আজ পৃথিবীর সব রাষ্ট্রচিন্তাবিদ উদ্বেলিত চিত্তে খুঁজে ফেরে
হীরামণিমুক্তোর মতোন মুজিবের রাষ্ট্রদর্শন।

সুদূর শৈশবে, মা-বাবা হারিয়ে কাউকে আর হারাতে চাওনি তুমি;
তাই, অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে কী আনন্দের সংসার
তুমি সাজিয়েছিলে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে
মাটির মায়ায় বেঁধেছিলে সারা বাংলার সকল সন্তানেরে;
বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে–কারাগার থেকে পাঠানো নির্দেশ
লক্ষ্মীমন্ত তোমার হাতের স্পর্শে শহরে বন্দরে নদীতে প্রান্তরে
ফসলের মাঠে মাঠে মানুষের প্রাণে প্রাণে গিয়েছে ছড়িয়ে।

৭ই মার্চের দুপুরে-মাগো, কী-যে মহামন্ত্র তুমি তুলে দিলে
বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবের কানে–
রেসকোর্সের উত্তাল জনসমুদ্রে পৃথিবী কাঁপানো ভাষণে
স্বাধীনতাপ্রিয় জনতার অগ্নিঝরা মুক্তির স্লোগানে
নিরস্ত্র বাঙালি জাতি মুহূর্তে সশস্ত্র হলো–
সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।
মুক্তিযুদ্ধকালে মৃত্যুর মুখোমুখি কী দুঃসহ বন্দি জীবন তোমার!
আশৈশব সুখে-দুঃখে আগলে রাখা মুজিব ফাঁসির দণ্ড নিয়ে
হাজার মাইল দূরে খুনিদের অন্ধকার কারাগারে;
বীরপুত্র কামাল-জামাল যুদ্ধের রক্তাক্ত রণাঙ্গনে;
গুলি আর বোমার প্রচণ্ড শব্দে তোমার রাসেল
ছোট্ট দুটি হাতে গভীর মায়ায় তুলো গুঁজে দেয়
হাসিনার সদ্যপ্রসূত পুত্র জয়ের কানে;
নিটোল কিশোরীকন্যা রেহানার নীরব কান্নায়
জোনাকির আলো নিভে যায় করুণ সন্ধ্যায়;
সারারাত সেজদায় তোমার অশ্রুর আলোকরশ্মিতে উদ্ভাসিত হয়
দূর কারাগারে বন্দি মুজিবের অবিচল মুখ আর বাঙালির জয়!

তারপর, রক্তে ঘামে ও সম্ভ্রমে ভিজে প্রিয় স্বাধীনতা আসে
তারপর, কোটি জনতার অশ্রুতে, ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে
লাল-সবুজের পতাকা উড়িয়ে সে মহামানব ফিরে আসে;
প্রিয় মাতৃভূমি মুক্তির আনন্দে নবজীবনের উল্লাসে ভাসে।

মা, হঠাৎ এ কেমন কৃষ্ণপক্ষ নেমে আসে তোমার আকাশে!
পঁচাত্তরে–নৃশংস আগস্টের অসহায় অন্ধকারে
ঘাতকের বুলেটের নির্দয় আঘাতে প্রাণপ্রিয় পুত্র–
কামাল, জামাল আর অবুঝ রাসেল সোনাকে হারিয়ে
প্রিয়তম মুজিবের লুটিয়ে পড়ার নির্মম করুণ দৃশ্য দেখে
অঝোর কান্নায় তুমি দুহাত তুলেছো আকাশের দিকে;
মাগো, শোকে পাথর হয়েও বাংলার ঘরে ঘরে
অগণিত সন্তানের শুভকামনায়–অসীম প্রজ্ঞায়
দেশমাতৃকার তরে তোমার দুইকন্যাকে উৎসর্গ করে
পবিত্র অঞ্জলি ভরে জীবনের অন্তিম প্রার্থনা শেষে
প্রভাতপূর্বের ম্লান জোছনায় ভেসে ভেসে
তুমি চলে গেছ পরম শান্তির দেশে।

তোমার দৃঢ়তা ধৈর্য প্রজ্ঞা আর ভালোবাসা বুকে নিয়ে
বীরকন্যা শেখ হাসিনা পিতার স্বপ্নে ও সাহসে বলীয়ান হয়ে
মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর নিরন্তর সংগ্রামে চলেছে এগিয়ে;
মা, তোমার স্নেহময় আঁচলের ছায়ায় পত্র-পল্লবে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশ
আজ ধনে-মানে-ধানে ফুলে-ফলেভরা পৃথিবীর এক নতুন বিস্ময়।

মাগো, তোমার কথাই বারবার মনে পড়ে... মনে পড়ে...

মার্চের আগুন ও অশুভের ছায়া

আসাদ মান্নান

পাক আমলেই নয় শুধু, হাজার শতাব্দী ধরে
কী দুঃসহ শোষণে পেষণে জর্জরিত রাম-রহিমের
বাংলার মাটি ও তার জীর্ণ শীর্ণ নিরন্ন মানুষ!
সবুজ বনানী থেকে শুরু করে পাটের গুদাম
হাড্ডিসার কৃষকের কষ্টে বোনা জীবনের বীজ
নদী নালা খাল বিল হাওড়ের শালুক পাপিয়া
লাশ হয়ে ভেসে গেছে পচা গলা ভাসানের জলে–
যে যায় এমন করে চলে যায় অদৃশ্য গাঙুরে!

ভাঙাচোরা বাতিঘরে কৃষ্ণপক্ষ; মুরগির খোপরে
অন্ধকারে ঢুকে পড়ে রাতজাগা শিকারি শিয়াল–
বুকে বাজে তীব্র হাহাকার; রক্তশূন্য জনপদে
শকুন-শকুনি আর শাপগ্রস্ত পঙ্গপাল ওড়ে।
জরাগ্রস্ত জন্মভূমি, ঘরে ঘরে অভুক্ত শিশুর
ক্ষণে ক্ষণে মর্মভেদী কী করুণ কান্নার আওয়াজ :
অন্ন নাই বস্ত্র নাই পথ্য বলে কিছুই ছিল না–
এমন বিপন্ন এক হতশ্রী দেশের সব চেয়ে
অধিক অবহেলিত এক গাঁয়ে জন্ম নেয়া
অপূর্ব সুন্দর ওই সাহসী খোকার প্রাণে কেন
অভাগা মায়ের জন্যে জন্মে
অবিনাশী দেশপ্রেম?
রবীন্দ্রনাথের গানে কে তাকে গোপন মন্ত্র দেয়,
দেশটাকে ভালোবেসে গেয়ে ওঠো মরণ বিজয়ী
সেই গান ডি. এল. রায়ের–'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'।

তারপর রক্তগামী ইতিহাসে অগ্নি জ্বেলে জ্বেলে
এ কোমল মৃত্তিকায় উঁচু মাথা ঠেকাতে ঠেকাতে
কারাগার থেকে কারাগারে যেতে যেতে একদিন
দীর্ঘদেহী খোকা হলো সব শোষিতের প্রিয় নেতা,

অতঃপর বঙ্গবন্ধু; এ চির উন্নত মম শির–
আকাশ বিদীর্ণ করে মুক্তি দূত স্বরূপে দাঁড়ান :
তাঁর পদতলে মাথা ঠুকে নত হয় হিমালয়;
বুকে তাঁর বহে চলে কত শত দুর্বিনীত নদী;
একটা নতুন দেশ স্বপ্নে দেখতে দেখতে তিনি শুনলেন
রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁর প্রাণে মরমিয়া টানে
বেজে ওঠে জন্ম থেকে গেঁথে থাকা
বাণী অপরূপ :
'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'–
এ মধুর গান কণ্ঠে তুলে চারণের বেশে
তিনি
অবিরাম ছুটেছেন গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে–
দুঃসাহসিক অভিযানে নূহের কিস্তির মতো
তাঁর স্বপ্নজয়ী ওই নৌকাখানি ভাসালেন,
কী উত্তাল জনসমুদ্রের প্রমত্ত ঢেউয়ের তালে তালে
এলো সেই অগ্নিঝরা মার্চ ১৯৭১–সংখ্যা থেকে জন্ম নেয় স্বাধীনতা–মহাইতিহাস :
হ্যাঁ, তিনি এমন বীর সুদর্শন কবিদের কবি–
তাঁর ডাকে জেগে ওঠে বেহুলার ঘুমন্ত ঘুঙুর,
নদীর ওলান ছেড়ে জলবতী মেঘের ঔরসে
তাঁর নামে মুখ ঘষে সমুদ্রের জরায়ু মণ্ডল–
তেরশ নদীর জলে ডুবে থাকা বদ্বীপের বুকে
আরো এক নদী ছিল নাম তার বঞ্চনার নদী,
হাজার বছর ধরে বহে চলা ওই নদীটাকে
কে তিনি থামিয়ে দেন তাঁর সেই অবিনাশী ডাকে :
ভাইয়েরা আমার!
রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো,
এ দেশের মানুষকে
মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ!'
জানি, মানুষের মুক্তির জন্য প্রথমে দরকার দেশের মুক্তির;
তিনি সে মুক্তির পথে দেশটাকে মুক্ত করেছেন,
কিন্তু হায়! জন্ম দোষে অকৃতজ্ঞ মানুষগুলোকে
কী করে মুক্ত করতেন!–আহা, তিনি তা পারেননি;
কী করে পারতেন! তার আগেই
অমানুষ ঘাতকেরা
বাংলার মানচিত্রের মতো তাঁর বুকটাকে বুলেটে বুলেটে ঝাঁজরা করে দেয়;
তারপর দেখতে দেখতে নতুন নিয়মে শুরু হয়

পুরাতন খেলা; দেশটা ভূতের পায়ে হাঁটতে থাকে–
পেছনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে দেখা যায় দেখতে দেখতে
একদিন বেলা ডুবে যায়, আলো ছাড়া সূর্য ওঠে
ঘড়ির কাঁটায়; তবু রাহু চণ্ডালের হাড় থেকে
এক ভীতিকর দীর্ঘতর ছায়া নামে চতুর্দিকে;
তাকে ঘিরে অশুভের আস্ফালনে ডাকিনী উল্লাস।

কবি নেই; তাঁর মহা কবিতার অমরত্বে কেউ
আজো হায়েনার হিংস্রতায় দাঁত বসাতে পারেনি :
মাঝে মাঝে কবি চোখ বন্ধ করে বাতাসের বুকে
কান পেতে শোনে :
এমন দেশের জন্য গান বাঁধে হরিনাম জপে
জয় গুরু সকলের প্রিয় অন্ধ ফকির লালন,
আত্মভোলা দীন হীন কবি ও কাঙাল হরিনাথ;
অন্ন নাই বস্ত্র নাই হাড্ডিসাড় কলুর বলদ
নিরন্তর জীবনের ঘানি টানে; বধূ চলে গেছে–
মধুবনে মধুহীন সর্ষে খেতে মৃত প্রজাপতি;
যদিও এমন দৃশ্য আজকাল কোথাও দেখি না,
তবুও বলতেই হবে, গোলাপের পাপড়িগুলো
এখনও ঠিক নিরাপদে আছে বলা তো যায় না!
বুনো শুয়োরের দল যে কোনো সময় তছনছ করে দেবে আমাদের মার্চের বাগান।
আশঙ্কার কথা বটে; তবে এও ঠিক আমাদের
প্রতিবর্গ ইঞ্চি মাটির উপরে জ্বলছে চিরন্তন
ওই মহামানবের অবিনাশী গৌরবের শিখা;
আমরা করি না ভয়–আমাদের বিজয় উদ্যানে,
মহাকাব্যে আড়ালে দাঁড়িয়ে যিনি বাঙালির তিনি
মহামতি চিরঞ্জীব পিতা বঙ্গবন্ধু মুজিবুর–
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে আজো দুঃসময়ে তিনি
মার্চের আগুন জ্বেলে তাড়াচ্ছেন অশুভের ছায়া।

এই এখানেই স্বাধীনতার ডাকে
আসলাম সানী

এখান থেকেই আমাদের সূচনা–ওই ডাক আসে
এই সবুজে-শ্যামলে ঢাকা মুক্ত নরম-কোমল দূর্বাঘাসে
মেঘেরা ফিরে ফিরে আসে ঝড়-ঝঞ্ঝায়-শীতল বাতাসে
নেমে আসেন এক মহামানব এই দুর্বার রেসকোর্স ময়দানে
শোষিত-লাঞ্ছিত-বঞ্চিত নিপীড়িত–দঃ আফ্রিকা-ভিয়েতকাম-প্যালেস্টাইনের দীর্ঘশ্বাসে–

এখানে শুভ্রসফেদ এক মহান পুরুষের বজ্র হাঁকে
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া–এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে
এই তেরোশত নদী পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-বঙ্গোপসাগরের বাঁকে বাঁকে
এই ষড়ঋতুর নানা স্বরে-শব্দে তাল-লয়-মাত্রা উপমায় নানা ছবি আঁকে
ডাকে–এই আমার লাল-সবুজের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা মাকে–

এই এখানে এই রেসকোর্স এক কালজয়ী কবিতার নন্দিত প্রেক্ষাপট
আসে দিগ্‌বিজয়ী মানব মুক্তি টুঙ্গিপাড়ার ভ্রূণে গাঁথা স্বাধীনতার শ্লোক
নেরুদা-চে গুয়েভারা-নাজিম হিকমতের কাব্য-উচ্চারণ–দৃপ্ত শপথ
মাইকেল-বিদ্যাসাগর-রামমোহন-সূর্যসেন-নেতাজীর কণ্ঠশ্রুত দৃঢ়
৭ই মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক–লাল-সবুজের বাংলাদেশ বাঙালির ভবিষ্যৎ

এখানে এখন মুক্তকাব্য রচে রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দ-জসীমউদ্‌দীন জাগে
প্রাণন্ত কৃষক-শ্রমিক-কামার-কুমোর-তাঁতী-জেলের নৌকার পালে হাওয়া লাগে
অমরত্ব ইতিহাস ছুঁয়ে যায় সতেরোশ' সাতান্ন উনিশশ' বাহান্ন একাত্তরের মুগ্ধ অনুরাগে
লালন-হাছন-রাধারমণ, জয়নুল-সুলতান, চর্যাপদ-গীতাঞ্জলি-অগ্নিবীণা দেখাদেখি
এই এখানেই মানবতা-শান্তি-গণতন্ত্র-সম্প্রীতি জুলিও কুরির শেখ মুজিব স্বাধীনতায় ডাকে...

রমনার রৌদ্রে কয়েকটি গাছের গ্রাফিক্স
ঝর্না রহমান

কুয়াশার করুণ নাট্যমঞ্চে কোরাস গাইতে এসে
সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা গাছ।
ওদের কণ্ঠে স্বর ফুটছিল না। ওদের জিভ আড়ষ্ট।
রঙ্গমঞ্চের বাজনদারগণ অশ্বখুর বোল তুলে ফাটিয়ে ফেলে ঢোল,
চেঁচিয়ে বলে গা রে ব্যাটা গা। সারেগামাপা!
এখন তো শীত নেই। তোদের কি জমাট বেঁধেছে জিভ,
নাকি পাথরের হাত-পা? মার্চ কর মার্চ! ডান বাম ডান!
কুয়াশার শীতার্ত সন্ধ্যা গাছের গায়ে মাকড়সার মতো বুনে দেয়
উত্তুরে হাওয়ার ফুলকো সুতোর সফেদ চাদর।
গাছদের পাশে আসে আরও গাছ। অনেক গাছ।
গথিক রীতিতে ওরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়ায়।
নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে। এখন কি সত্যিই এসেছে উত্তপ্ত মার্চ!
তাহলে চারপাশে এত কুয়াশা কেন! চল আমরা সূর্যের দিকে হাত বাড়াই।
যেখানে আছে অগ্নিভ আঙুলের সংকেত।
অতঃপর প্রতিটি গাছের ভেতর থেকে
অগ্নিশিখার মতো এক-একটি শাখা আকাশের দিকে উঠে যেতে থাকে।
ওদের পাতাগুলো সতেজ জিভ নেড়ে গেয়ে ওঠে অনলবর্ষী মার্চের কোরাস।
রাজকীয় ঢুলিগণ ঢোলফাটানো নিনাদে আবহসংগীত বাজিয়ে চলে।
ওদের বধির কর্ণে সেই সুর পৌঁছায় না। শীতার্ত রাত্রি পাড়ি দিয়ে
কয়েকটি গাছের গ্রাফিক্স মার্চের মিছিল নিয়ে রমনার রৌদ্রে এসে দাঁড়ায়।

বলো হে বাঙালি
মিনার মনসুর

কত না সহজে তুমি আজ বলো–স্বাধীনতা, মুক্তি!
বলো–কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না
বলো–বাংলার সন্তান আর কখনোই হারবে না
কোথা থেকে পেলে, বলো হে বাঙালি, মৃত্যুঞ্জয়ী এইসব উক্তি?

২
পেটে নেই ভাত তবু কী আনন্দে মা মা বলে ডাকি
আবদুল হাকিম জানেন, জানেন ধীরেন্দ্রনাথ
বাঙালির পথে পথে বিষধর কত কালো হাত
হাজার বছর ধরে পায়েও শৃঙ্খল তবু সব ভুলে থাকি!

বলে কী বলে কী শোনো দূরাগত দুর্বত্তের দল :
যাবে না মা বলে ডাকা–উর্দু কেবল উর্দুই হবে সাহি বাত
সহসা মধ্যদুপুরে রুদ্ধবাক্ বাংলাজুড়ে নেমে আসে ঘোর অমা-রাত
বাজে ধর্মের দামামা–নষ্টদের কী বিচিত্র ছল!

৩
তারপর ক্রমে টলে ওঠে পায়ের তলার মাটি
সুশীলরা বলে, থাক থাক
ডানে-বামে শত মোশতাক
দাসেরা উল্লাস করে–চতুর্দিকে শেয়ালের ঘাঁটি!

৪
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়াজুড়ে শুধু হাহা রব
তবে কি নষ্টের অধিকারে যাবে সব?

৫
তখনই তর্জনী–শুধু একটি তর্জনী–বলে ওঠে কথা
বজ্রের গর্জনে কেঁপে ওঠে আসমুদ্র হিমাচল
কাঁপে খল কাঁপে যত অন্ধকার আদিম শৃঙ্খল
আর কত না সহজে তুমি বলো–মুক্তি, স্বাধীনতা!

নক্ষত্রের তর্জনী আজো ডাক দিয়ে যায়
আনিসুল হক

যখন আঁধার আসে, পথ খুঁজে পাই না কিছুতে
যখন পতন আসে, আমাদের গন্তব্য নিচুতে
তখন আমরা ফের ওই দূরে তাকাই আকাশে
তখন নক্ষত্র দেখি, আমাদের জন্য আঁকা সে :

ওই যে নক্ষত্র ধ্রুব, বেপথু জাহাজটিকে গন্তব্য দেখায়
ওই যে পাঞ্জাবি সাদা, ওই যে তর্জনী উঁচু, আলোর লেখায়
বলে দিচ্ছে : হতাশা জেনো না।
ডাক দিচ্ছে : নিচুতা মেনো না।

আমাদের পাথরপুরীতে,
কালো জাদুকর এসে সব প্রাণ কেড়ে নিয়ে গেছে এক ভীষণ তুড়িতে :
আমরা পাথর সব, প্রাণহীন, নিষ্প্রাণ পাথর :
গাছ নেই, নদী স্থির, পাখিরা নিথর :
তখনই এলেন সেই দেবদূত, দেবদূত নয়,
বাঙালি গায়ের রং, মেঘমন্দ্র, কণ্ঠ উঁচু লয়:
যখনই বললেন তিনি ভাইসব,
অমনি নড়ে উঠল মৃতপ্রাণ শব,
জেগে উঠল পাখিদের মধ্যে কলরব,
নদীতে জাগল কলতান :
মৃত্যপুরীতে ঐ জেগে ওঠে প্রাণ।

বললেন, সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না।
অমনি জেগে উঠল সাত কোটি, বিশ্বের চারশ কোটি প্রাণ

বললেন, দুর্গ গড়ো প্রতিঘরে,
যার যা কিছু আছে, তা নিয়ে প্রস্তুত হও সবে,
মুহূর্তে মৃত্যু ভুলে অচেতনতা ছিঁড়ে
জেগে উঠল মানচিত্র জীবন-উৎসবে

যেই জাতি পররাজ্যে কোনোদিন আক্রমণ করে নাই
দ্যাখো, সেই জাতি, কিষান, শ্রমিক, ছাত্রযুবা, নারী-বৃদ্ধ
প্রতিরোধে তুলে নিলো যার যা কিছু আছে, তাই,
অকাতরে দিলো প্রাণ, আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন, বন্ধুরা
কেউ আমাদের আর মারতে পারে নাই।

তিনি বললেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার,
রক্তে আঁকা হলো তাই মানচিত্র তোমার-আমার
তিনি বললেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির,
আমরা কি মর্যাদা রাখব না তাঁর সে উক্তির?

সভাশেষে বললেন, একদিন আপনারা আমাকে
এনেছিলেন বন্দিশালা থেকে
রক্ত দিয়ে, আপনাদের সাথে রক্তঋণ,
সেই ঋণ শোধ করে যাব একদিন।

তিনি কথা রেখেছেন, নিজের বুকের রক্ত তিনি ঢেলেছেন;
শোধ করেছেন রক্তঋণ
আমরা কি সেই ঋণ শোধ করে যাব না,
আনব না মুক্তির সুদিন!

স্বাধীনতা দিয়েছেন, মুক্তি দিতে গিয়ে ঘুমিয়ে আছেন মুক্তিদাতা;
চলো বলি মুক্তিমন্ত্র, গণতন্ত্র, সাম্য-প্রীতি, বৈষম্যহীনতা;
চলো আনি ন্যায়বিচার, ধর্মনিরপেক্ষতা–
আলোর তর্জনী সদা ডাক দিয়ে বলে সে বারতা।

একটি কবিতা এবং দমিত মানুষের জেগে ওঠা
মনিরুস সালেহীন

হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ যদি কবিতা হয়,
কবিতা যদি হয় হৃদয়মথিত শ্রেষ্ঠ শব্দের শিল্পিত বিন্যাসে
শ্রেষ্ঠ কবিতাটি সেদিন লিখা হয়েছিল–
রেসকোর্সের সবুজে উত্তাল জনসমুদ্রের পাতায়
৭ই মার্চের গনগনে দুপুরে বজ্রকণ্ঠে।

দুঃখ ভারাক্রান্ত কবি হাজির হলেন আমাদের মাঝে
মেঘমালায় ঢাকা সূর্যের মতো
আমরা তার দুঃখের গহিনে দেখলাম
সেখানে প্রস্তুত এক কাঞ্চন
উদ্ভাসিত অন্তরে মুক্তির অবিনাশী গান।

কবি আমাদের প্রস্তুত হতে বললেন।
বললেন, তোমাদের যা কিছু আছে...
আমাদের রাইফেল-বোমা-বন্দুক কিছুই ছিল না
আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেদের সশস্ত্র করি
হাজার বছরের পুঞ্জীভূত বেদনা
মুক্তি তৃষ্ণার্ত রক্তাক্ত হৃদয়
মায়ের জন্য সন্তানের ভালোবাসার মতো অকুতোভয় ভালোবাসা
প্রেমের জন্য ত্যাগের মতো ত্যাগ
এইসব মারণাস্ত্র দিয়ে।

তুমি বললে, 'তোমরা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো'
দুর্গ গড়ার সামর্থ্য আমাদের ছিল না
আমরা আমাদের হৃদয়কে দুর্গ বানালাম–
তোমার ডাকে সাড়ে সাত কোটি দুর্গ তৈরি হলো বাংলায়।

মুক্তির স্বপ্ন
একবুক ভালোবাসা
প্রিয় মাটির সোঁদা গন্ধ

আর জীবনবাজি পণ
দিয়ে তৈরি হলো আমাদের এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ।
ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘৃণা কিংবা ভয়–কোনো অস্ত্রই পারেনি সে দুর্গের দেয়াল ভাঙতে।

সেদিন তুমি আমাদের দিলে আমাদের শ্রেষ্ঠতম কবিতা
তুমি দিলে স্বপ্ন, বাঁচার এবং বাঁচানোর
তুমি দিলে না-বলার ঔদ্ধত্য
তুমি দিলে মাকে, ভাইকে, প্রেমিককে ভালোবাসার এবং তা প্রকাশের স্পর্ধা
হাজার বছর আমরা অবরুদ্ধ ছিলাম সেই অধিকার থেকে।

কবি, সেদিন তুমি আমাদের দিলে 'স্বাধীনতা' নামের মোহন শব্দ
নতুন স্বপ্নদিশায় যাত্রা শুরুর সবুজ পতাকা।

হে মহান, কবিতার সেই বজ্রদুপুরের পর থেকে কেউ আর আমাদের 'দাবায়া' রাখতে পারেনি।

৭ই মার্চ
তারিক সুজাত

একটি দিনের
শুরু ছিল শুধু
অফুরান আহ্বানে
শত-শৃঙ্খল হাজার বছর
ছিন্ন হয়েছিল বজ্রকণ্ঠ গানে
সাত কোটি জোড়া চোখ
স্থির হয়েছিল
অনির্বাণ একটি আঙুলে
একটি কণ্ঠে
জেগে উঠেছিল সারাদেশ
সেই থেকে শুরু
'রক্ত শপথে' এগিয়ে যাওয়ার ধ্বনি
মুক্তি ও বাঁচার অধিকারে সংহত,
'একটি জাতির জন্ম' উদ্বেল-উন্মেষ
শত সংগ্রামের অমেয় আখ্যান
'বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস'
অনাদি অতীত থেকে আগামীর অভিযানে
খুলে গিয়েছিল প্রাণের উৎসমুখ
সেই থেকে শুরু
একটি দিনের চেতনার শিখা
মিশে গেছে মহাকালে।

৭ই মার্চের ভাষণ ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

মুনতাসীর মামুন

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রমনা রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল ঠিকই, কিন্তু নিছক স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার তা ছিল না। পাকিস্তান নামক উপনিবেশে তার ২৩ বছর বসবাসের অভিজ্ঞতার সংহত রূপ ছিল ৭ই মার্চের বক্তৃতা। ওই ২৩ বছরের অভিজ্ঞতা ছিল তিক্ত, যন্ত্রণাময়, নিপীড়নমূলক। সুতরাং ৭ই মার্চ এক অর্থে ছিল কলোনিতে বসবাসকারী একজন রাজনীতিবিদের বক্তৃতা যিনি তার অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখাচ্ছিলেন এবং দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন, স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন স্বাধীনতার। সে বক্তৃতা ছিল উপনিবেশে বসবাসকারী একজনের অভিজ্ঞতা এবং একইসঙ্গে সেই উপনিবেশের ইতিহাস।

মার্চ মাসে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। ১লা মার্চ ১৯৭১ সালে শুরু হয়েছিল সেই বিখ্যাত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলন এমন জোরালো ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল যে তা সৃষ্টি করেছিল এক সমান্তরাল রাষ্ট্রের। ২লা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তোলিত হয়েছিল বাংলাদেশের পতাকা (প্রথম পতাকা)। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন এক ধরনের স্বাধীনতার। ১৭ই মার্চ তাঁর জন্মদিন। ২৫শে মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনী শুরু করেছিল পৃথিবীর জঘন্যতম এবং বৃহত্তম গণহত্যা। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন স্বাধীনতা। এক কথায়, মার্চ আমাদের। জীবনে এক স্বপ্নের মাস।

মার্চ এলেই স্বপ্নেরা হানা দেয়। আমি, আমরা বন্ধুরা প্রতিবছর এ মাসে ১৯৭১-এর মার্চে ফিরে যাই। তখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আমাদের যৌবনের শুরু। চারদিকে শুধু স্বপ্ন। আর মনোভাব, অজেয় কিছু নেই। ১৯৭১ সালের পর আমাদের বয়সের সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও বিয়াল্লিশ বছর। তখনকার তরুণ এখন বৃদ্ধ। কিন্তু মার্চ এলেই ফিরে যাই ১৯৭১-এ, মার্চ এলেই মনে হয় সবকিছু জয় করা সম্ভব। মার্চ এলেই আমি স্মৃতি জাগরূক করতে চাই। এই স্মৃতিগুচ্ছ ১৯৭৫- ১৯৯০, ২০০১-০৮ পর্যন্ত শাসকরা বিভিন্নভাবে মুছে দিতে চেয়েছে। দুঃশাসনের মূল স্ট্র্যাটেজিই হলো স্মৃতি মুছে দেওয়া। মার্চের স্মৃতিগুচ্ছের অন্যতম ৭ই মার্চ। বাকিগুলো হলো–১লা মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন শাসকরা স্থগিত করার পর 'তোমার আমার ঠিকানা–পদ্মা মেঘনা যমুনা' স্লোগান নিয়ে মানুষের রাজপথ ভরিয়ে তোলা, কারফিউতে গুলি খেয়ে 'জয় বাংলা' বলা, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি। এক জীবনে স্বচক্ষে এত ঘটনা

দেখা ও অংশগ্রহণ বিরল ব্যাপার। আমরা ভাগ্যবান। কারণ আমরা এসব ঘটনার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। মার্চ আমার যৌবন।

মার্চ আমাদের জন্য স্বপ্ন দেখারও মাস। এ মাসেই আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম ভবিষ্যতের, ভবিষ্যৎ জয়ের। আর এই মার্চের অনেক ঘটনা থেকেই শক্তি আহরণের চেষ্টা করি বর্তমানকে বোঝার জন্য। স্মৃতি জাগরূক রাখি আর দেখি, বর্তমানের প্রতিবন্ধকতা কিছুই নয়, আমরা এগোচ্ছি জয়ের দিকে।

৭ই মার্চের বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি ২৬শে মার্চ তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও কিছু আসত-যেত না। ৭ই মার্চেই একরকম স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে পছন্দ করেন না এমন অনেকে এখনো বলেন যে, বক্তৃতা শেষে তিনি 'জয় বাংলা'র পর 'জয় পাকিস্তান' বা 'জিয়ে পাকিস্তান' বলেছিলেন। এমনকি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানও তা বিশ্বাস করেন। আমি ছিলাম সেদিন রেসকোর্সে। ওই শব্দ দুটি শুনিনি। পরে মনে হলো, যদি বঙ্গবন্ধু তা বলেও থাকেন তাতে কী আসে-যায়? এই কারণে কি বলা যাবে তিনি বাংলাদেশ চাননি? বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমি মানুষ, তাই আমি ভুল করলে তা সংশোধন করতে পারি।" প্রকৃত একজন সৎ রাজনীতিবিদের কথা। বাংলাদেশে তিনিই একমাত্র রাজনীতিবিদ যিনি একাগ্রচিত্তে বাঙালিদের জন্য একটি বাসভূমি চেয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশের একমাত্র রাজনীতিবিদ যিনি বাঙালির মুক্তির জন্য একইসঙ্গে গণতান্ত্রিক ও সশস্ত্র পন্থার কথা চিন্তা করেছিলেন। পাকিস্তানের কাঠামোয় বাস করে গণতান্ত্রিক পন্থায় সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। কিন্তু একইসঙ্গে বোধহয় এই বিশ্বাসও করতেন, পাকিস্তানিদের মতো বর্বররা কখনো গণতান্ত্রিক পন্থায় সমঝোতায় আসবে না। অন্তিমে সশস্ত্র পন্থাই হবে উত্তম। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী। সুভাষ বসু ছিলেন তাঁর কাছে এক বীর। সুভাষ বসু অকেটারলনি মনুমেন্ট অপসারণের যে আন্দোলন করেছিলেন তাতে যোগ দিয়েই তরুণ মুজিবের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ অন্তিমে বাঙালিকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন সশস্ত্র পন্থার জন্য তৈরি হতে।

১লা মার্চ ১৯৭১। ঢাকা স্টেডিয়ামে খেলা চলছে বিসিসিপি ও আন্তর্জাতিক একাদশের। ক্রিকেট খেলা। স্টেডিয়াম প্রায় ভর্তি। চাপা টেনশন থাকলেও শহর শান্ত। বেলা একটার সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেতার ভাষণ দিলেন যার মূল কথা ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত। বেতার ভাষণটি শেষ হতে না হতেই পুরো শহরটি বদলে যেতে লাগল। যেন আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে শহর। 'ইত্তেফাক' থেকে আমরা কজন বেরিয়েছি রাস্তায়। এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছে ছোটো ছোটো মিছিল, যাচ্ছে গুলিস্তান, পল্টন। পূর্বাণী হোটেলের সামনে মিছিল আর স্লোগান 'জয় বাংলা', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্ম-মেঘনা-যমুনা', 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু...'।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ পণ্ড। খেলোয়াড়রা দৌড়ে আশ্রয় নিয়েছেন ড্রেসিং রুমে। স্টেডিয়ামের কোথাও কোথাও জ্বলছে আগুন। সব মানুষ যেন রাস্তায়। হোটেল পূর্বাণীর সামনে লোকে লোকারণ্য। বিকাল তিনটায় সেখানে আওয়ামী লীগের

পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক। বঙ্গবন্ধু ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত হতে বলে দুদিনের কর্মসূচি দিলেন আর বললেন, ৭ই মার্চ হবে জনসভা। সেখানে তিনি তার বক্তব্য দেবেন।

১লা মার্চ থেকে ৭ই মার্চ প্রতিদিন কিছু না কিছু ঘটতে থাকে ঢাকা শহরে, সারা দেশে। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-জনতার সামনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ আর গগনবিদারী স্লোগান–'জয় বাংলা', 'জ...য়...বা...ং...লা।' সন্ধ্যায় জারি করা হয় কারফিউ। মানুষ বলে 'জয় বাংলা' আর রাস্তায় নামে, মানুষ বলে 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' আর কারফিউ ভাঙে, মানুষ বলে 'জয় বাংলা' আর গুলি খায়, আবারও বলে 'জয় বাংলা', আবারও গুলি খায়। হাসপাতালে বুলেটবিদ্ধ মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে আর গভীর রাতে শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে বলেন, 'বাংলাদেশে আগুন জ্বালাবেন না। যদি জ্বালান, সে দাবানল হতে আপনারাও রেহাই পাবেন না।... সাবধান, শক্তি দিয়ে জনগণের মোকাবিলা করবেন না।'

'একাত্তরের ৩রা মার্চ আগের রাতের শহিদদের নিয়ে মিছিল বের হয়। পল্টনে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রণীত এক শাসনতন্ত্র যদি না চান তা হলে আপনাদের শাসনতন্ত্র আপনারা রচনা করুন। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র আমরাই রচনা করব।' 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু', 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে পল্টনের চারদিক।

শেখ মুজিব বললেন, 'বাংলার মানুষ খাজনা দেয়, ট্যাক্স দেয় রাষ্ট্র চালানোর জন্য, গুলি খাওয়ার জন্য নয়। গরিব বাঙালির টাকায় কেনা বুলেটের ঘায়ে কাপুরুষের মতো গণহত্যার বদলে অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিন। ...২৩ বছর ধরে রক্ত দিয়ে আসছি। প্রয়োজনে আবার বুকের রক্ত দেব। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বীর শহিদদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করব না।' বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন–'ভাইয়েরা আবার আমি বলছি, আমি থাকি আর না থাকি, আমার সহকর্মীরা আছেন। তারাই নেতৃত্ব দেবেন। আর যদি কেউ না থাকে, তবু আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি বাঙালিকে নেতা হয়ে নির্ভয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।' চারদিক থেকে গগনবিদারী গর্জন শোনা যায়, 'জয় বাংলা', 'জয় বাংলা'।

বঙ্গবন্ধুর জামাতা ওয়াজেদ মিয়া লিখেছেন, "৩রা জানুয়ারি রাতে বঙ্গবন্ধু সবাইকে নিয়ে খেতে বসেছেন। এক পর্যায়ে গম্ভীর হয়ে আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'দেশটা যদি কোনো দিন স্বাধীন হয়, তা হলে দেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করো।"

ধরে নিতে পারি, ওই দিন যখন প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের শপথগ্রহণ করাচ্ছিলেন তখনই তার মনে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণার রূপরেখাটি চূড়ান্তভাবে ধরা দিয়েছিল। যে জন্য হঠাৎ সেদিন জাতীয় সংগীতের কথা বলেছিলেন।

৫ই মার্চ। লিখেছেন ওয়াজেদ মিয়া, ইয়াহিয়া খানের ভাষণ শোনার জন্য নিজে একটি ট্রানজিস্টার নিয়ে একলা তা শোনার জন্য নিজের ঘরে গেলেন। ভাষণ শেষ হওয়ার

ঘণ্টাখানেক পর বের হলেন ঘর থেকে। ডেকে পাঠালেন চার জাতীয় নেতা ও খন্দকার মোশতাক এবং ড. কামাল হোসেনকে। লাইব্রেরির ঘরে তাদের নিয়ে ঘণ্টাখানেক আলোচনা করলেন। ওয়াজেদ মিয়া, সিরাজুল আলম খান ও সফি বঙ্গবন্ধুকে ছাত্রদের কথা জানান। পরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। ড. কামাল হোসেনের সহায়তায় তাজউদ্দীন আহমদ বিবৃতিটি তৈরি করেন। এ বিবৃতির শেষাংশে বলা হয়েছিল– "শহীদের রক্তে রঞ্জিত রাস্তার রক্ত এখনো শুকোয়নি। শহীদদের পবিত্র রক্ত পদদলিত করে ১০ই মার্চ তারিখে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগ যোগদান করতে পারে না।" ৭ই মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু এ কথাটি বলেছিলেন।

রাতে সারা দেশে মানুষ কারফিউ ভেঙে নেমে আসে রাস্তায় আর বলে 'জয় বাংলা', খালি বলে 'জয় বাংলা'। ৭৫ জন লাশ হয়ে পড়ে থাকে রাস্তায়, অগণিত মানুষ কাতরাতে থাকে গুলি খেয়ে–তবু বলে 'জয় বাংলা'।

৭ই মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ শুধু চিৎকার করে বলেছে–'জয় বাংলা'। আর বদলে পেয়েছে গুলি। আমরা ভাবছি কী বলবেন বঙ্গবন্ধু? তিনি কি বলবেন, বাংলাদেশ হয়ে গেছে স্বাধীন? কিন্তু আর বলার বাকি কী? বরং তিনি যদি না বলেন, তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে মানুষ। ইতোমধ্যে উত্তোলিত হয়েছে স্বাধীন বাংলার পতাকা আর বাংলাদেশ ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে সেই গগনবিদারী আওয়াজে 'জয় বাংলা! জয় বাংলা!'

ড. কামাল হোসেন লিখেছেন, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কী বলবেন তা ঠিক করার জন্য ৬ই মার্চ বসল আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সভা।

"সারা দেশে প্রত্যাশা দেখা দিয়েছিল যে, ৭ই মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। বস্তুত ছাত্র ও যুবসমাজ এ ধরনের ঘোষণার প্রবল পক্ষপাতী ছিল। ৭ই মার্চ নাগাদ দলীয় সদস্যদের মধ্যে সামান্যই সন্দেহ ছিল যে, ছাত্রসমাজ, যুব সম্প্রদায় এবং রাজনীতি সচেতন ব্যাপক জনগণের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে কম কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না।"

সুতরাং দল এবং দলীয় নেতা শেখ মুজিবের ওপর দায়িত্ব এসে পড়েছিল এমন কিছু না বলা, যা পাকিস্তানি পক্ষকে তখনই অজুহাত দেবে অপ্রস্তুত জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। আবার একইসঙ্গে চাঙ্গা রাখতে হবে আন্দোলন ও জনগণকে। এ ভারসাম্য বজায় রাখা নিতান্ত সহজ ছিল না। এ ছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে তখনো তাকে কাজ করতে হচ্ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে যেখানে তাঁর অবস্থান ছিল সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। এখন আমাদের কাছে ব্যাপারটি যত সহজ মনে হচ্ছে তখন নিশ্চয় তা ছিল না। এ ছাড়া ছিল তরুণ বিশেষ করে ছাত্রদের প্রবল চাপ। তারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে ফেলেছেন। আন্দোলনের তারাই ছিলেন মূল চালিকাশক্তি। তাদের বিরূপ করা সম্ভব ছিল না।

৬ই মার্চ আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটিতে আলোচনার পর, লিখেছেন ড. কামাল হোসেন, "বিবেচনা করে দেখা হলো যে, যদি আন্দোলনের জোয়ার ধরে রাখা এবং জনগণের ঐক্য জোরদার করা যায় তা হলে ইয়াহিয়া ও সামরিক জান্তার কাছে এটা

স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, পরদিন খোলাখুলি স্বাধীনতা ঘোষণার অবস্থান নেওয়া হবে না। ইয়াহিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরা হবে এবং ওই সব দাবির সমর্থনে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।"

পান্না কায়সার লিখেছেন, তার স্বামী শহীদুল্লা কায়সার (১৯৭১ সালে শহিদ) তাকে ৭ই মার্চের ভাষণ শুনতে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিলেন। বলেছিলেন, "তোমার জীবদ্দশায় এমন ভাষণ শোনার সৌভাগ্য হবে না। চলো, কিছুক্ষণ থেকে চলে এসো। আমার সন্তান তার জন্মের আগেই স্বাধীনতার ঘোষণা শুনবে। তোমার জীবনে এ দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

আসলে আমরা সবাই স্বাধীনতার ঘোষণাটি শুনতে চেয়েছিলাম, আর কিছু নয়। এবং এ আশা ছিল মনে যে, বঙ্গবন্ধু আমাদের নিরাশ করবেন না।

অনেক পরে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর যখন তার নাম প্রকাশ্যে বলতেও অনেকে ছিলেন ভীত তখন ৭ই মার্চের কথা স্মরণ করে নির্মলেন্দু গুণ লিখেছিলেন তার সেই অনবদ্য কবিতাটি–

"একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মুক্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে–
কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি'?...
শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল
হৃদয়ে লাগিল দোলা
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা–
কে রোধে তাহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তার অমর কবিতাখানি।"

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন–

"আমি আব্বার মাথার কাছে বসে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। এটা ছিল আমার রুটিনওয়ার্ক। আমি সবসময় করতাম। ভাবতাম এটা না করতে পারলে আমার জীবন বৃথা। আব্বা যখন খাটে শুতেন, বালিশটা নামিয়ে আমার বসার জন্য একটা জায়গা করে দিতেন। আমি আব্বার মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছিলাম। মা পাশে এসে বসলেন। বললেন, 'আজ সারা দেশের মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। সামনে তোমার বাঁশের লাঠি, জনগণ আর পেছনে বন্দুক। এই মানুষদের তোমাকে বাঁচাতেও হবে–এই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হবে। অনেকে অনেক কথা বলবে–তোমার মনে যে ঠিক চিন্তাটা থাকবে–তুমি সেই কথাটা বলবে–আর কারো কথায় কান দেবা না। তোমার নিজের চিন্তা থেকে যেটা আসবে যেটা সভাকে বলবা। এই ছোট্ট কথাটুকু মা আমার আব্বাকে ঐ সভায় যাবার আগে বলে দিয়েছিলেন।"

৭ই মার্চের বক্তৃতায় যে স্বতঃস্ফূর্ততা সেটি হয়তো এই পরামর্শ থেকেই এসেছে। ৭ই মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু এই দাবিগুলো তুলে ধরেছিলেন।

৭ই মার্চ দুপুর থেকে ঢাকা শহর এগোতে থাকে রমনা রেসকোর্সের দিকে। মনে আছে, রেসকোর্সের এক কোণে আমি, কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ও রফিক নওশাদ বিক্রি করছি সারা রাত ধরে ছাপা লেখকদের মুখপত্র 'প্রতিরোধ', যার হেডলাইন 'আপসের প্রস্তাব আগুনে জ্বালিয়ে দাও' এ রকম একটা কিছু। পরে ৭ই মার্চ সম্পর্কিত বিবিসির ভিডিও দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এত মানুষ! যেন পুরো ঢাকা শহর জমায়েত হয়েছে রেসকোর্সে। রেসকোর্সের একদিকে স্লোগান–'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', তো অন্যদিকে–'পাঞ্জাব না বাংলা–বাংলা, বাংলা'। হয়তো মাঝখানে 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', তো অন্য কোথাও–'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।' মঞ্চের সামনে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' কিন্তু যখনই কেউ বলে ওঠে, 'জয় বাংলা' তখনই নদীর ঢেউয়ের মতো সেই ধ্বনি ছড়িয়ে যেতে থাকে আর চারদিক কাঁপিয়ে সেই অমোঘ শব্দটি উচ্চারিত হয়–'জয় বাংলা'।

৭ই মার্চ সকাল থেকে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতাদের আগমনে ৩২ নম্বর মুখরিত হয়ে ওঠে। ড. ওয়াজেদ মিয়া জানালেন, তাজউদ্দীন, কামারুজ্জামান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক, ড. কামাল হোসেন ও আরও কয়েকজনকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু তার লাইব্রেরিতে বসলেন। ঘণ্টাখানেক বৈঠকের পর বঙ্গবন্ধু বেরিয়ে সবাইকে বললেন, ছাত্রজনতার দাবির প্রতি তারা একমত এবং রেসকোর্সে চার দফা দাবি পেশ করা হবে।

এরপর বঙ্গবন্ধু ওপরে চলে যান। গোসল করে খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন ড. কামাল চার দফার খসড়াটি তাকে দেখিয়ে আনেন। মোহাম্মদ হানিফ যখন তা টাইপ করছেন তখন বঙ্গবন্ধু ড. ওয়াজেদকে বলেন খসড়ার টাইপ করা কপি মিলিয়ে দেখতে। এটি ইশতেহার আকারে বিলি করা হবে। সেখানে চারটি দাবি ছিল–

১. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে
২. যারা ১লা মার্চ থেকে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তাদের শাস্তি দিতে হবে
৩. সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে এবং
৪. সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

তিনটের পর বঙ্গবন্ধু ঘর থেকে বেরোলেন। সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের বললেন–'আমি সভামঞ্চে পৌঁছার পূর্বেই তোমরা সভামঞ্চের চারদিকে উপস্থিত দেশি-বিদেশি সাংবাদিকবৃন্দের মধ্যে এই ইশতেহারের কপি বিতরণ করবে।' তারপর আবার তিনি দোতলায় উঠে গেলেন সভায় যাওয়ার আগে তৈরি হতে।

শেষের কথাটি আগে বলে ফেলি। সভা শেষ করে সেদিন রাতে সবাইকে নিয়ে খেতে বসেছেন বঙ্গবন্ধু। লিখেছেন ওয়াজেদ মিয়া, 'এক সময় বললেন, আমার যা বলার ছিল আজকের জনসভায় তা প্রকাশ্যে বলে ফেলেছি। সরকার এখন আমাকে যে কোনো মুহূর্তে গ্রেপ্তার বা হত্যা করতে পারে। সেজন্য আজ থেকে তোমরা প্রতিদিন দু'বেলা আমার সঙ্গে একত্রে খাবে।' ২৫শে মার্চ পর্যন্ত পরিবারের সবাই তা পালন করেছিল।

দুপুর তিনটার মধ্যে রেসকোর্স লোকে লোকারণ্য। রেডিও পাকিস্তান ও পাকিস্তান টেলিভিশন এখনকার মতো তখনো ছিল সরকারি। শেখ মুজিব জেনেশুনেই

বলেছিলেন–"মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনান তা হলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।"

রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচারের বন্দোবস্ত করল। পাকিস্তানি সেনা অফিসার সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, 'রেডিওর ঘোষকরা আগে থেকেই রেসকোর্স থেকে ইস্পাতদৃঢ় লক্ষ দর্শকের নজিরবিহীন উদ্দীপনার কথা প্রচার করতে শুরু করল।' সালিক আরও লিখেছিলেন, এ ব্যাপারে সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তর হস্তক্ষেপ করে এই বাজে ব্যাপারটি বন্ধের নির্দেশ দিলো। সালিকও তা রেডিও কর্তৃপক্ষকে জানালেন। আদেশ শুনে টেলিফোনের অপর প্রান্তে বাঙালি অফিসারটি বললেন, 'আমরা যদি সাড়ে সাত কোটি জনগণের কণ্ঠ প্রচার করতে না পারি তা হলে আমরা কাজই করব না। এই কথার সাথে সাথে বেতার কেন্দ্র নীরব হয়ে গেল।'

বাঙালি সে সময় এ ধরনের সাহস দেখানোর ক্ষমতা দেখিয়েছিল। কারণ তারা বঙ্গবন্ধুর ওপর এই বিশ্বাস স্থাপন করেছিল যে, তিনি বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না। রেডিওতে ভাষণটি অবশেষে প্রচারিত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু এসে মঞ্চে উঠলেন। সারা রেসকোর্স কাঁপিয়ে ঝড়ো হাওয়ার মতো সেই শব্দটি বয়ে গেল–'জয় বাংলা!'

মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম বীর-উত্তম লিখেছেন, 'কী যে মধু মাখা ছিল এই স্লোগানে! এর ইন্দ্রজালিক শক্তির পরিধি নিরূপণের ক্ষমতা বুঝি কারও নেই।' গণঅভ্যুত্থানের সময় এবং যুদ্ধকালে এ স্লোগান বাঙালি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। জীবনবাজি রেখে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এই উক্তি যে উদ্দীপনা জোগাত তার তুলনা নেই। তাই 'জয় বাংলা' জয়ধ্বনি আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ওই দিনের রেসকোর্সের জনসভার একটি চিত্র ও মানুষের আবেগের পরিচয় পাওয়া যায় রশীদ হায়দারের একটি বিবরণে। বিবরণটি খানিকটা দীর্ঘ কিন্তু যারা ৭ই মার্চ দেখেনি তাদের বোঝার জন্য এটি প্রয়োজন।

> "লাল সূর্যের মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্র সংবলিত গাঢ় সবুজ রঙের পতাকা হাতে হাতে উড়ছে হাজারে হাজারে, বড় পতাকাটি উড়ছে বঙ্গবন্ধু যেখানে ভাষণ দেবেন ঠিক তার ওপরে...।
>
> এই সভায় অসংখ্য মহিলা এসেছেন বাঁশের লাঠি নিয়ে, বহুলোক এসেছেন তীর-ধনুক নিয়ে, যেন যুদ্ধ আসন্ন। মানুষ কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে-সে সময়ে প্ল্যান্ট প্রটেকশনের একটি বিমান জনসভার বেশ ওপর দিয়ে উড়ে যায়; লোক ওটাতেই শত্রু সৈন্য আছে ভেবে কেউ কেউ লাঠি ছুড়ে মারে; কারও কারও অনুমান ওটাতে টিক্কা খান আছেন।...
>
> দেখা গেল মেয়েদের ভিড়ে একজন অশিক্ষিত মেয়ে মনোয়ারা বিবি নিজের রচিত গান গাইছে : 'মরি, হায়রে হায়। দুঃখের সীমা নেই। সোনার বাংলা শ্মশান হইল পরান ফাইডা যায়'; দেশাত্মবোধক ভাটিয়ালি গানও শোনায় মনোয়ারা বিবি, দেখা যায় গত

> কয়েক দিনের দুঃখজনক ঘটনাসংবলিত হাতে লেখা পত্রিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলেজের ছাত্র সৈয়দ আজিজুল হক, দেখা গেল বাপের কাঁধে দুই-তিন বছরের শিশু বিশাল জনসমাবেশে দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।"

বঙ্গবন্ধু মঞ্চে ওঠেন। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি আর কালো মুজিবকোট পরনে। আমরা যারা টিএসসির মোড়ে তারা দূর থেকে ঝাপসা একটি অবয়ব দেখি। সভায় কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই। কালো, ভারী ফ্রেমের চশমাটি খুলে রাখলেন ঢালু টেবিলের ওপর। শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ভাইয়েরা আমার! আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন, সবই বোঝেন।'

উনিশ মিনিটের ভাষণ, লিখিত নয়। কিন্তু একবারও থমকাতে হয়নি। পরে বিবিসির ভিডিওতে ক্লোজআপে দেখেছি আবেগে কাঁপছে তার মুখ, কিন্তু সমস্ত অবয়বে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। বোঝা যায় তিনি পিছাবেন না।

'ভাইয়েরা আমার'–তার বিষাদাচ্ছন্ন স্বর সবাইকে স্তব্ধ করে দেয়। 'আপনারা সবই জানেন, সবই বোঝেন'–এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার সঙ্গী হয়ে যাই, তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা এক হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমরাও তো সব জানি, সব বুঝি।

বঙ্গবন্ধুর এই জানাটা কিন্তু হয়েছিল অনেক আগে, আমাদের মতো আমজনতার বোঝার আগেই। সে কারণেই তিনি নেতা হতে পেরেছেন এবং তার সমসাময়িক অনেক রাজনীতিবিদই নেতা হতে পারেনি।

১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ হওয়ার পর জেল থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। বাড়ি গেলেন। তার বাবা চেয়েছিলেন তিনি ব্যারিস্টারি পড়ে আসুন বিলাত থেকে। সব বাবার মতো তার বাবারও একটি স্বপ্ন ছিল সন্তানকে ঘিরে। তিনি তাতে রাজি হননি। লিখেছেন 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে–

> "আমার ভীষণ জেদ হয়েছে মুসলিম লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে। যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম, এখন দেখি তার উল্টো হয়েছে। এর একটা পরিবর্তন করা দরকার। জনগণ আমাদের জানত এবং আমাদের কাছেই প্রশ্ন করত। স্বাধীন হয়েছে দেশ, তবু মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর হবে না কেন? দুর্নীতি বেড়ে গেছে, খাদ্যাভাব দেখা গিয়েছে। বিনা বিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের জেলে বদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মুসলিম লীগ নেতারা মানবে না। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পকারখানা গড়া শুরু হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের দিকে নজর দেয়া হচ্ছে না। রাজধানী করাচি। সব কিছুই পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব বাংলায় কিছুই নাই।"

দেখা যাচ্ছে, পঞ্চাশ দশকের আগেই পাকিস্তান সম্পর্কে তার ধারণা স্বচ্ছ হয়ে আসছে। পাকিস্তানের ভেতর থেকে বাঙালিদের জন্য লড়াই করবেন, এই ইচ্ছেটাও দৃঢ় হচ্ছে। যে কারণে দেখি, দশটা-পাঁচটা মানুষের মতো বা দশটা-পাঁচটা রাজনীতিবিদের মতো অতি-সংসারী জীবন বেছে নেননি। পুরো জীবনটাই উৎসর্গ করেছেন রাজনীতির জন্য যে রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালির ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠা করা এবং তার এ অনুভব ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর পরই। মুসলিম কর্মী

শিবির ১৯৪৮ সালে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। পুস্তিকার নাম 'পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভাগা জনসাধারণ'। নামটি লক্ষ করুন। প্রকাশক শেখ মুজিবুর রহমান ও নাঈমউদ্দিন আহমদ। পুস্তিকাটি আমি পাইনি। কিন্তু একটি প্রবন্ধে এর উদ্ধৃতি পেয়েছি। তাতে দেখা যায় তখনই তিনি পূর্ববাংলার প্রতি অবহেলার কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল–'আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী গঠনে কী করেছেন? কেন্দ্রীয় পাকিস্তান গভর্নমেন্ট সিন্ধুর মতো জায়গায় সুনিয়ন্ত্রিত রাজধানী গঠনের কাজে যদি অনেক ধাপ এগিয়ে যেতে পারেন তবে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী গঠনে মন দিতে পারছেন না কেন?'

কেন আজ এই অবস্থা, প্রথমে তার একটা বর্ণনা দিলেন বঙ্গবন্ধু। বাঙালি আর কিছু নয়, শুধু তার অধিকার চেয়েছে সবসময় আর শুধুমাত্র এটুকু চাওয়ার জন্যই তার ওপর নেমে এসেছে নিপীড়নের খড়্গ। ভোট হয়েছে বাঙালি জিতেছে কিন্তু এখন কেন কখনো তাকে ক্ষমতায় বসতে দেওয়া হয়নি, বললেন তিনি, 'দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।'

১৯৫২ সালে ভাষার জন্য বাঙালি রক্ত দিয়েছে। ১৯৫৪ সালে ভোটে জয়লাভ করলেও ক্ষমতা বাঙালির হাতে দেওয়া হয়নি। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে খালি বাঙালির ওপর গুলি চালানো হয়েছে। হ্যাঁ, ঠিকই তো, আমাদের পূর্ব ইতিহাস, স্মৃতি আমাদের মনে পড়ে যায়, উত্তেজিত হয়ে উঠি আমরা, ঠিকই তো আর কত গুলি খাবে বাঙালি?

বঙ্গবন্ধু জানালেন, ইয়াহিয়া এসে বললেন, 'দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।' নির্বাচন হয়েছে। বঙ্গবন্ধু জানালেন, বাঙালি নির্বাচনে জিতেছে, সংসদে বসবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টো বাধা দিচ্ছেন। আর ইয়াহিয়া খান তার কথা শুনছেন কিন্তু দোষ দিচ্ছেন আমাদের। বেদনামাখা কণ্ঠে বললেন, "কী পেলাম আমরা... আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।"

আমাদের মনে হয় বক্তৃতার প্রতিটি কথাই তো ঠিক। আমরা তো মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে চেয়েছি। কিন্তু তারা আমাদের শুধু পদানত রাখতে চায়। এটা তো মানা যায় না। সত্যিই তো–"কী পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী আর্তমানুষের মধ্যে। তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি।"

আমরা তখনো পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে বসবাস করছি। আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী হতে পারি না। সংখ্যাগরিষ্ঠ তো কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদী হতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তারা সহজে গ্রহণ করতে চায় না। তাই নিজের দেশের মানুষের ইতিহাস বর্ণনা করে তিনি এই বার্তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দিতে

চাইলেন, বাঙালি সবসময় শান্তির পক্ষে। পশ্চিম পাকিস্তান, কেন্দ্রীয় সরকার অশান্তির পক্ষে এবং বাঙালিকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে শুধু বঞ্চিতই নয়, গুলি করে তাদের দমানোর চেষ্টা করছে। তিনি পাকিস্তান কাঠামোর মধ্য থেকেই শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। হয়তো এই কারণেই বিরুদ্ধবাদীরা গুজব ছড়াচ্ছিল। শীঘ্রই একটি গোলটেবিল বৈঠক হবে এবং তাতে সমঝোতা হবে। আমরা তরুণরা তো তা মানি না। এটা তো বঙ্গবন্ধু জানতেন। তাই তিনি বললেন, 'আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি তো অনেক আগেই বলেছি, কীসের আরটিসি?'

চারদিক তাকিয়ে বঙ্গবন্ধু আবার বললেন, '২৫ তারিখ অ্যাসেম্বলি কল করেছে। কিন্তু আমি বলে দিয়েছি যে, ওই শহিদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।'
আমরা উদ্বেলিত হয়ে ওঠি। ন্যায্য কথা বলেছেন তিনি, এ না হলে নেতা!
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কথা মনে রেখে জানালেন, তিনি অ্যাসেম্বলিতে যাওয়ার কথা বিবেচনা করবেন। অর্থাৎ একতরফাভাবে আলোচনা ভেঙে দেওয়ার পক্ষে তিনি নন। কারণ তিনি তো যৌক্তিক পথে চলতে চান। তবে হ্যাঁ, তিনি যাবেন, তবে তার চারটি শর্ত আছে–
১. সামরিক আইন তুলে নিতে হবে।
২. সৈন্যদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে নিতে হবে।
৩. যেসব হত্যা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর
৪. জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে রেসকোর্স। বঙ্গবন্ধু বল ঠেলে দিয়েছেন ইয়াহিয়া-ভুট্টোর কোর্টে। সবার মনে হয়েছে, তিনি তো ঠিকই বলেছেন। এই সামান্য দাবি না মানলে সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা সমঝোতা করবেন কীভাবে। আর দাবি মানলে ইয়াহিয়া ভুট্টো থাকেন না, থাকেন বাঙালি আর তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা তো স্বীকার করতে হবে, তিনি তো শান্তিপূর্ণ অবস্থানই চেয়েছেন। এই দূরদর্শিতা পরবর্তীকালে বাঙালি, বাংলাদেশকে সহায়তা করেছিল। বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করতে পেরেছিল তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা 'ডিউ প্রসেস অব ল' বা আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে চলছিল, পাকিস্তান সরকার সেই আইনি প্রক্রিয়া মানেনি। এ কারণে, সারা পৃথিবীর সিভিল সমাজ স্বচ্ছন্দে বাঙালিদের সমর্থন করেছিল। স্বাধীনতা ঘোষণার বিরুদ্ধে অন্যান্য রাষ্ট্রেরও বলার তেমন কিছু ছিল না। কারণ বাংলাদেশ ঘটনা তো বায়াফ্রার ঘটনা নয়। ১০ই এপ্রিল যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিল বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর থেকে তার প্রথম ছয়টি অনুচ্ছেদ দেখুন। ওই বক্তৃতার আলোকেই নির্মাণ করা হয়েছে ঐ কয়টি অনুচ্ছেদ। আমি সেই ছয়টি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি–

> "যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহুত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে... ।"

বঙ্গবন্ধু কি জানতেন না, পাকিস্তানিদের প্রতিক্রিয়া কী হবে? বিলক্ষণ জানতেন। সে জন্য দুটি কৌশল তিনি নির্ধারণ করেন। এক. সারা বিশ্বকে দেখানো যে, বাঙালি আলোচনার পথ খোলা রাখছে দেখে শান্তিপূর্ণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করছে। এ ধরনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে কার্যত কিছু বলার নেই। বাস্তবে পূর্ব পাকিস্তানে তখন সব কিছু অচল হয়ে গেল।

দ্বিতীয় হলো, তিনি জানতেন অন্তিমে তাকে গ্রেপ্তার বা হত্যা করা হতে পারে। তা হলে বাঙালি কী করবে সেই নির্দেশও দিয়ে গেলেন।

বঙ্গবন্ধু বললেন, "আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাছারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।" এটিই হলো অসহযোগ আন্দোলন। তবে ১লা মার্চ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানুষ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। মানুষজনকে এ কথা বলতেও তিনি ভোলেননি যে, ২৮ তারিখে যেন সবাই বেতন নিয়ে আসেন। শ্রমিকদের সাহায্য-সহায়তার কথাও তিনি বলেছেন। অভুক্ত থেকে আন্দোলন করা যায় না সেটা তিনি জানতেন। একবার ভেবে দেখুন, কত খুঁটিনাটি বিষয়েও তিনি মনোযোগ দিয়েছেন।

না লেখা বক্তৃতায় এসব অনেক কথা বাদ পড়ে যায়। কিন্তু এই বক্তৃতায় তা হয়নি। একইসঙ্গে অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি যাতে না হয় সে সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন। এটি ছিল তার অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। সাম্প্রদায়িকতা যে সমাজরাষ্ট্র তছনছ করে দেয়, ব্যক্তির জীবন হয়ে ওঠে বেদনার-যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো খুব কম রাজনীতিবিদই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতা যে সমাজরাষ্ট্র বিপন্ন করে তোলে তা যৌবনের শুরুতেই বুঝেছিলেন। আরও পরে তিনি ফরিদপুর জেলে বন্দি। গোপালগঞ্জের গান্ধীবাদী সমাজকর্মী চন্দ্রঘোষ তখন জেলে। স্বজনহীন চন্দ্রঘোষ মরণাপন্ন। চিকিৎসার জন্য তাকে জেলের

বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি বললেন, "আমার তো কেউ নাই। আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে একবার দেখতে চাই, সে আমার ভাইয়ের মতো। জীবনে তো আর দেখা হবে না।..." লিখেছেন শেখ মুজিব, "আমাকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হল। চন্দ্রঘোষ স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন। দেখে মনে হলো, আর বাঁচবেন না। আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'ভাই, এরা আমাকে সাম্প্রদায়িক বলে বদনাম দিল; শুধু এই দুঃখ মরার সময়। কোনোদিন হিন্দু মুসলমানকে দুই চোখে দেখি নাই। আমার তো কেউ নাই। সকলকে আমাকে ক্ষমা করে দিতে বলো। আর তোমার কাছে আমার অনুরোধ রইল, মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখো। মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য ভগবানও করেন নাই। আমার তো কেউ নাই, আপন ভেবে তোমাকেই শেষ দেখা দেখে নিলাম। ভগবান তোমার মঙ্গল করুক।'

...আমার চোখেও পানি এসে গিয়েছিল। বললাম, 'চিন্তা করবেন না, আমি মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখি, রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ।'

এ কথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। ১৯৪৬ সালের পর থেকে কলকাতা, ফরিদপুর, ঢাকা যেখানেই দাঙ্গা হয়েছে সেখানেই তা প্রতিরোধে জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

তাঁর এ বিশ্বাস ফিরে এসেছে ৭ই মার্চের বক্তৃতায়। বক্তৃতার শেষাংশে তিনি বললেন, "শোনেন-মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-নন-বেঙ্গলি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপরে, আমাদের ওপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়।" বাঙালি তার কথা মনে রেখেছিল। শুধু তা-ই নয়, ১৯৭২ সালে তাঁর সে বিশ্বাসের কারণে, বাংলাদেশের সংবিধানে চারটি মূলনীতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্যতম নীতি হিসেবে সংযোজিত হয়েছিল। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও রাজনীতি তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন।

যা বলছিলাম, তিনি যদি না থাকেন বা তাঁর অনুরোধ যদি কর্তৃপক্ষ না রাখে তা হলে বাঙালি কী করবে? "এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের ওপর আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার না-ও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব।"

বছর ১৫ আগে আমরা একটা জরিপ করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে। তৃণমূল পর্যায়ে প্রায় ১০০০ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। তাতে একটি প্রশ্ন ছিল, আপনি কি ৭ই মার্চের বক্তৃতা শুনেছেন? সবাই উত্তর দিয়েছিলেন শুনেছেন। যারা ময়দানে ছিলেন না তারা ট্রানজিস্টরে অথবা লোকমুখে। প্রায় সব বাঙালিই বক্তৃতাটি শুনেছিলেন বা

পড়েছিলেন]। অন্য আরেকটি প্রশ্ন ছিল; বক্তৃতার কোন অংশটি আপনার মনে আছে [ছিল? সবাই উত্তর দিয়েছিলেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।'] তিনি যে গেরিলাযুদ্ধের কৌশল বলেছিলেন, বাঙালি তা মনে রেখেছিল। রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু সেই যে ডাক দিয়েছিলেন– "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে", সে আহ্বান বাংলার মানুষ অক্ষরে অক্ষরে মনে রেখেছিল। সেভাবেই তারা প্রস্তুত হয়েছিল একাত্তরের মরণপণ স্বাধীনতার জন্য।

তৃণমূল মানুষেরা বলেছিলেন আর তারা বক্তৃতার শেষ দুটি লাইন মনে রেখেছিলেন–অর্থাৎ "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। এ ব্যাপারে আরেকটি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। তিনি প্রথমে মুক্তির কথা বলেছেন।

এই মুক্তি হচ্ছে উপনিবেশের যাবতীয় শৃঙ্খল থেকে সার্বিক মুক্তি, ব্যাপক অর্থে। স্বাধীনতা শব্দটির ব্যাপকতা সীমিত। অর্থাৎ স্বাধীনতা পেলে শুধু চলবে না, আমাদের সব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে হবে। সে কারণেই আমাদের যুদ্ধ ছিল মুক্তিযুদ্ধ এবং জনযুদ্ধ। হ্যাঁ, স্বাধীনতার যুদ্ধও। এবং সে কারণেই ১৯৭২ সালের সংবিধানে চারটি মূল উপাদানের তিনটি ছিল–গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার শেষ লাইন ছিল–"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তার সারা জীবনের লক্ষ্য যা ছিল তা শেষ বাক্যে সমাপ্ত করেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় ঢাকায় এসেছিলেন, দেখা করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। প্রশ্ন করেছিলেন তার ভাষায়, 'বাংলাদেশের আইডিয়াটা প্রথম কবে আপনার মাথায় এলো?'

'শুনবেন? তিনি মুচকি হেসে বললেন, সেই ১৯৪৭ সালে। আমি সুহরায়দী (সোহরাওয়ার্দী) সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্ত বঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালির এক দেশ। বাঙালিরা এক হলে কী না করতে পারব। তারা জগৎ জয় করতে পারত। They could conquer the world.'

বলতে বলতে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। তারপর বিমর্ষ হয়ে বললেন, "দিল্লি থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন সুহরায়দী ও শরৎ বোস। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ রাজি নয় তাদের প্রস্তাবে। তারা হাল ছেড়ে দেন। আমিও দেখি যে আর কোনো উপায় নেই। ঢাকায় চলে এসে নতুন করে আরম্ভ করি। তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নিই। কিন্তু আমার স্বপ্ন সোনার বাংলা। সে স্বপ্ন কেমন করে পূর্ণ হবে এই আমার চিন্তা। হবার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। লোকগুলো যা কমিউনাল! বাংলাদেশ তাই বললে সন্দেহ করত। হঠাৎ একদিন রব উঠল, আমরা চাই বাংলা ভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষাভিত্তিক আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দিই দেশভিত্তিক আন্দোলনে। পরে একদিন আসে যেদিন আমি আমার দলের লোকদের জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশের নাম কী হবে? কেউ বলে, পাক বাংলা। কেউ বলে পূর্ববাংলা। আমি বলি না বাংলাদেশ।" পূর্ববঙ্গের মানুষ তাঁর সেই স্বপ্ন সফল করেছিল।

৭ই মার্চ যিনি রেসকোর্সে ছিলেন না, তাকে বোঝানো যাবে না ৭ই মার্চ কী ছিল বাংলাদেশের জন্য। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ বাঙালিমাত্রই জানেন। এই ভাষণের প্রতিটি উক্তিই উদ্ধৃতিযোগ্য। কিন্তু মূল বক্তব্যটি ছিল–"আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।" সবশেষে বললেন, যা শোনার জন্য উন্মুখ ছিল বাংলাদেশ– "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

কঠিন সঙ্কটে এত ভারসাম্যপূর্ণ অথচ আবেগময় বক্তৃতার সংখ্যা বিরল। কীভাবে তিনি তা পেরেছিলেন আজ ভাবলে অবাক লাগে। পাকিস্তানি সৈনিক সিদ্দিক সালিক লিখেছেন–

> "বক্তৃতার শেষ দিকে তিনি জনতাকে শান্ত এবং অহিংস থাকার উপদেশ দিলেন। যে জনতা সাগরের ঢেউয়ের মতো প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে রেসকোর্সে ভেঙে পড়েছিল–ভাটার টান ধরা জোয়ারের মতো তারা ঘরে ফিরে চলল। তাদের ধর্মীয় কোনো জনসমাবেশ তথা মসজিদ কিংবা গির্জা থেকে ফিরে আসা জনতার ঢলের মতোই দেখাচ্ছিল এবং ফিরে আসছে তারা সন্তুষ্টচিত্তে–ঐশীবাণী বুকে ধরে। তাদের ভেতরকার সেই আগুন যেন থিতিয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেই আগুনকে ধাবিত করা যেত। আমাদের অনেকেরই আশঙ্কা ছিল এ রকমই। এই বক্তৃতা সামরিক আইন সদর দপ্তরে স্বস্তির বাতাস বইয়ে দিল। সদর দপ্তর থেকে টেলিফোনে কথোপকথনকালে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান যে, এখন সামরিক আইন প্রশাসক বলেছেন, এই পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে উত্তম ভাষণ।"

অনেকে হতাশও হয়েছিলেন, যেমন–তৎকালীন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির সদস্য রাশেদ খান মেনন ড. মোহাম্মদ হান্নানকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আন্ডারগ্রাউন্ড অবস্থায় থেকে আমরা এদিন রেসকোর্সের জনসভায় শেখ মুজিবের ভাষণ শুনতে গিয়েছিলাম। সারা শহরে রটে গিয়েছিল যে, শেখ মুজিব আজ স্বাধীনতার ঘোষণা করবেন এবং বড় ধরনের একটা ঘটনা আজ ঘটবে। কিন্তু আমরা হতাশ হয়ে ফিরে আসি।"

তবে এ ধরনের হতাশ হওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল কম। কমবেশি সবাই খুশি হয়েছিলেন। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এ রকম–সামরিক জান্তা যদি দাবি মেনে নেয় ভালো। না হলে, আমরা স্বাধীন হয়ে যাব। এর কোনো বিকল্প নেই। মানসিকভাবে স্বাধীনতার জন্য মানুষ প্রস্তুত হওয়ার সময় পেয়েছিল। চারদিকে প্রস্তুতিমূলক তৎপরতা শুরু হয়েছিল। আন্দোলনে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি এবং এই ভাষণ বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বিএনপির স্বপ্নদ্রষ্টা জিয়াউর রহমান লিখেছিলেন, "৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক 'গ্রিন সিগন্যাল' বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝে উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠেছিল।"

মঈদুল হাসান লিখেছেন, "সম্ভবত তিন সপ্তাহাধিককালের অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে বাংলার সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনায় এমন এক মৌল রূপান্তর ঘটে যে পাকিস্তানিদের নৃশংস গণহত্যা শুরুর সাথে সাথে বাংলার স্বাধীনতাই তাদের জন্য অভিন্ন ও একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি আক্রমণের সাথে সাথে অধিকাংশ মানুষের কাছে শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ঘোষণা হয়ে ওঠে এক অভ্রান্ত পথনির্দেশ।"

আমাদের এক ধরনের মানসিকতা হলো কোনো কিছুর মান নির্ধারণ করতে হলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনা করা। এ কারণে অনেকে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটিকে আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ ভাষণের সঙ্গে তুলনা করেন। কিন্তু তা ভুল। দুটি ভাষণ দুই রকম। লিংকন ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। দাসপ্রথা আমেরিকা থেকে তিনি তুলে দিতে চেয়েছিলেন। এ নিয়ে আমেরিকার রাজ্যগুলোর মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় ১৮৬৩ সালে। এক পক্ষে ছিল দাসপ্রথার সমর্থকরা, যাদের বলা হতো কনফেডারেট। আর বিরোধীরা ইউনিয়নিস্ট। ভার্জিনিয়ার গেটিসবার্গ শহরে দুপক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। অসংখ্য সৈন্য মারা যায়। ইউনিয়নিস্টরা জয়লাভ করে। লিংকন সে শহরে এসেছিলেন তাদের শ্রদ্ধা জানাতে। স্বাধীনতার আহ্বান জানানোর দায়-দায়িত্ব তার ছিল না। সীমাবদ্ধতাও ছিল না বঙ্গবন্ধুর মতো। সেখানে গণতন্ত্র রক্ষার আহ্বান জানিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন মিনিট তিনেকের। অন্যদিকে, বঙ্গবন্ধুর সীমাবদ্ধতা ছিল একটি রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে থেকে স্বাধীনতার জন্য একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করা এবং স্বাধীনতার আহ্বান জানানো। সঙ্গে সঙ্গে সেই আহ্বান যেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আহ্বান না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়েছিল। এই ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তির সনদপত্র। এর গুরুত্ব আরও বেশি। পাকিস্তানকে বাঙালিরা প্রত্যাখ্যান করে। আর সেদিনই শেখ মুজিবুর রহমান গণমানুষের চেতনায় জাতির জনক বা জাতির পিতায় রূপান্তরিত হন। সব শেষে 'জয় বাংলা'। এই দুটি শব্দকে নিছক স্লোগান নয় এটি প্রত্যয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে তা হলে বোঝা যাবে কেন 'জয় বাংলা' পাকিস্তানপন্থিদের গায়ে জ্বালা ধরায়। এটি যে একটি প্রত্যয় তার ব্যাখ্যাও বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়কে। তিনি বলেছিলেন, প্রথম যখন তিনি 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন "তখন ওরা বিদ্রুপ করে বলে, জয় বাংলা না জয় মা কালী! কী অপমান! সে অপমান সেদিন আমি হজম করি। আসলে ওরা আমাকে বুঝতে পারেনি। জয় বাংলা বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম বাংলা ভাষা (চেয়েছিলুম অন্নদাশঙ্করের ভাষা, বঙ্গবন্ধু কখনো এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করতেন না), বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জয় যা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে।"

এই ভাষণে তিনি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে একইসঙ্গে বিবৃত করেছেন। পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে থাকার যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা বিবৃত হয়েছে অতীত অধ্যায়ে। বর্তমান পরিস্থিতি এসেছে তারপর। সব শেষে এসেছে ভবিষ্যতের শত্রুকে কীভাবে পরাভূত করতে হবে তার রূপরেখা।

তিনি যখন ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে বা ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তখন ৭ই মার্চের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনার সারসংক্ষেপই তুলে ধরেন। তার স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল এ রকম–

This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achived.

একই হিসেবে বলা যায় এটি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদপত্র। এর গুরুত্ব সেই সব ভাষণ থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু বটেই, তার অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত বাঙালিরা পাকিস্তান বা পাকিস্তান প্রত্যয়টিকে প্রত্যাখ্যান করে। আর সেদিনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণমানুষের চেতনায় জাতির জনক বা জাতির পিতায় রূপান্তরিত হন।

এই ভাষণের আরেকটি গুরুত্ব এই যে, এখনো এর সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা। স্বৈরশাসনের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এ ভাষণ অনুপ্রেরণা জোগায়। আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কেন এবং কীভাবে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে। এই ভাষণ বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

মনে রাখা দরকার, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর জেনারেল জিয়া সেই ঐক্য ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। সেই থেকে দুই দশক এবং খালেদা ও গোলাম আযম এবং খালেদা জিয়া ও নিজামীর আমলে এক দশক মোট তিন দশক এই ভাষণ নিষিদ্ধ ছিল। নিষিদ্ধ ছিল 'জয় বাংলা' স্লোগানটিও। তখনো শুধু আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজন ২৬শে মার্চ, ১৫ই আগস্ট ও ১৬ই ডিসেম্বর ভাষণটির কথা বলতেন আর 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতেন। তারা মনে করিয়ে দিতে চাইতেন, এই ভাষণটিই ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা এবং বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ যদি সবাইকে উজ্জীবিত না করতো স্বাধীনতা হতো দিল্লি দূর অস্ত-এর মতো। শুধু তা-ই নয়, ফিরিয়ে আনতে হবে সেই স্লোগান বঙ্গবন্ধুর উচ্চারণের সঙ্গে যা পেয়েছিল সার্বজনীনতা, সেই 'জয় বাংলা'। আর নিজেরাও উদ্দীপ্ত হতে চাইতেন এই ভাষণ শুনে। জিয়াউর রহমান, জেনারেল এরশাদ, খালেদা জিয়া ও গোলাম আযম, নিজামী 'জয় বাংলা'র পরিবর্তে এনেছিলেন 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'। একটি বিষয় লক্ষণীয় বঙ্গবন্ধু হত্যার পরদিন থেকেই কিন্তু'জয় বাংলা' মুছে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ধ্বনি দেওয়া শুরু হয়। 'জিন্দাবাদ পাকিস্তান' ফিরিয়ে আনে। পাকিস্তানও একটি প্রত্যয় যার মধ্যে অন্তর্গত সামরিকায়ন, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মব্যবসা, শোষণ-নিপীড়ন, হত্যার চাষ হয়েছে। যে চারা তারা রোপণ করেছেন তা বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। 'জয় বাংলা' ছিল বাংলাদেশের প্রতীক। ১৯৭১ সালে বিদেশে বাঙালিদের পরিচয় ছিল 'জয় বাংলা'র লোক।

জিন্দাবাদ যখন দেশ উচ্ছন্নে নিচ্ছে এবং জিন্দাবাদ যখন বিচারের কাঠগড়ায় তখন জিন্দাবাদীরা তাদের শেষ যুদ্ধে নেমেছে। মনে রাখা দরকার জিন্দাবাদীরা নির্মূল না হলে রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে না। এবং জিন্দাবাদীরা যে সমাজ-রাষ্ট্র যতটা সম্ভব দখল করতে পেরেছিল তার একটি কারণ, আমাদের সহযোগিতা। এ জন্য

সমষ্টিগতভাবে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। বা বলা যেতে পারে এ আমাদের সমষ্টিগত লজ্জা।

গণজাগরণ মঞ্চের মাধ্যমে তারুণ্যের উত্থান হয়েছে এবং তারা ফিরিয়ে এনেছে সেই 'জয় বাংলা'। এই 'জয় বাংলা' যখন আধিপত্য বিস্তারকারী প্রত্যয়ে পরিণত হবে তখনই জাতি ঐক্যবদ্ধ হবে। এ দেশে '৫২, '৬৬, '৬৯, '৭০-৭১-এর আন্দোলন যুদ্ধে তরুণরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৭১ সালে 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে আমরা যেমন যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলাম, আজকে তরুণরা সেই 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়েই জামায়াত-বিএনপিকে পরাজিত করবে।

একটি সরকার বা বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আছে দেখেই কী সব নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে? পারবে না। আওয়ামী লীগবিরোধী কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়েছে বিএনপি, খালেদা জিয়া যার কেন্দ্রে।

১৯৭১ সালে হানাদারদের সহযোগী ছিল জামায়াতে ইসলামী। এখনো খালেদার সহযোগী জামায়াতে ইসলামী। এর বিরুদ্ধে সরকার একা সফল হবে না। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু এটি অনুধাবন করেছিলেন, "প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।" যদি বাংলাদেশবিরোধী পাকিস্তানমনাদের প্রতিহত করতে হয় তা হলে একইভাবে গ্রাম-মহল্লায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেতৃত্বে প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলতে হবে এবং তারা যেভাবে কাজ করছে সেভাবে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ তারা যদি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ করে তা হলে তাদের বিরুদ্ধেও সে ব্যবস্থা নিতে হবে। না নিলে হবে তাকে আবাসিত করা। এবং আমাদের ত্রিশ বছরের নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতার কারণেই আজ বিএনপি-জামায়াতের এই বাড়-বাড়ন্ত।

স্মরণাতীতকাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত আর কোনো ভাষণ শুনতে এত মানুষ কোথাও জমায়েত হয়নি। আমি এখনো যখন এর ভিডিও রূপ দেখি, তখন শিহরিত হই, ফিরে যাই নিজ যৌবনে, মনে হয় প্রয়োজনে সব অনাচার, স্বৈরাচার, কুআচার লন্ডভন্ড করে দেওয়ার লড়াইয়ে শামিল হতে পারি, এই বয়সেও। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ আমার যৌবন।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের পর শুধু ঢাকা শহর নয়, পুরো দেশটি বদলে যায়। বাষ্পে ভরা পাত্রের মতো টগবগ করতে থাকে ৭ কোটি মানুষ। জোরদার হয়ে ওঠে অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। শেখ মুজিবের নির্দেশই হয়ে ওঠে সরকারি নির্দেশ। মানুষ তা মানতে থাকে। এমনকি সরকারি প্রশাসনও। লিখেছেন ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর "১৯৭১-এর মার্চ মাসের অসহযোগ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো প্রত্যাখ্যান। পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে এই প্রতিরোধের সূত্রপাত। শেখ মুজিবুর রহমান একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এই প্রতিরোধকে একটি রাষ্ট্র গঠনে বদলে দেন। এক পক্ষে

অসহযোগের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো প্রত্যাখ্যান, অন্যপক্ষে অসহযোগের মাধ্যমে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রবর্তনের সম্ভাবনা জনমনে সত্য করে তোলা। এই রণকৌশল শেখ মুজিবুর রহমান ৩৫টি নির্দেশের মধ্য দিয়ে বাস্তব করে তোলেন।"

তিনি আরও লিখেছেন–"এই বিভিন্ন নির্দেশের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের ভিত্তি তৈরি করে দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় নীতিমালার নির্দেশ দেন। এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে জনসাধারণ, এই কর্তৃত্বের স্বরূপ সিভিল এবং সিভিল কর্তৃত্বের অন্তর্গত পুলিশ এবং মিলিটারি। শেখ মুজিবুর রহমান এভাবেই বঙ্গবন্ধু এবং জাতির জনকে রূপান্তরিত হয়ে যান। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা এ ক্ষেত্রেই।"

এভাবেই সৃষ্টি হয় একটি সমান্তরাল রাষ্ট্রের। সেদিক বিচার করলে ২৬শে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল একটি ফর্মাল ডিক্লারেশন মাত্র। আসলে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের পত্তন হয় ৭ই মার্চ। মহাত্মা গান্ধী এত স্বল্প সময়ে এত পরিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন করতে পারেননি। যারা পিছিয়ে ছিল এতদিন, ভুগছিল দোদুল্যমানতায় তারাও এগিয়ে আসতে থাকে। কী জানি কাঁরাভা যদি তাদের ফেলে এগিয়ে যায়। এভাবেই বাংলাদেশ এগোতে থাকে ২৫শে মার্চের দিকে। ওই যে সেদিন শেখ মুজিব আঙুল তুলে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বাঙালি তা মেনে চলে গিয়েছিল। পরাধীন পাকিস্তানে আর তারা ফিরে আসেনি।

Bangabandhu's 7th March Speech on UNESCO's World Heritage List: A Social and Communicological Analysis

A A M S Arefin Siddique

"Freedom? Oh, where can I find freedom? Where is freedom?"
– Rabindranath Tagore
"Courage and perseverance have a magical talisman before which difficulties disappear and obstacles vanish into air."
– John Quincy Adams

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

Certifies the inscription of

The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Department of Films and Publications
(Institution)

Dhaka (Town) *Bangladesh* (Country)

ON THE MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL REGISTER

30 October 2017
(Date)

Irina Bokova
Director-General, UNESCO

The Facsimile of of the UNESCO Director-General's Declaration

February 21 marks International Mother Language Day as well as Language Martyrs' Day. At the onset, we respectfully remember the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose extraordinary leadership we took part in the liberation war to gain the glory of living in an

independent Bangladesh. Also, we respectfully remember all language martyrs, who made the ultimate sacrifice on February 21, 1952, for the sanctity of the Bengali language. We also remember the selfless sacrifice of three million martyrs who died in 1971. Today we extend our deepest felicitations and greetings to all freedom fighters and word warriors who paved the way for a map for a nation that pivots on language, the People's Republic of Bangladesh.

Language is the main driving force of all fields including education, literature, culture, science, commerce, defence, and administration. In our mother tongue alone, we find the vitality of life and livelihood. Soon after the establishment of the state of Pakistan [in 1947], the arbitrary declaration of Governor General Jinnah [of making Urdu the only state language dented our aspirations] led to the language movement. Pakistanis ignored the essentiality of the Bengali language.

During the first phase of the national language movement, young student leader Sheikh Mujibur Rahman, a law faculty student of Dhaka University, was arrested on March 11, 1948. Before his arrest, he said, "The liberation of Bengali is not possible in this strange structure of Pakistan. The liberation of the Bengali people can come only in an independent motherland."

After independence, on May 6, 1972, Bangabandhu came to Dhaka University at the invitation of Dhaka University Central Students' Union and said, "The independence movement began on March 11, 1948." (Dainik Bangla, May 7, 1972).

February 21 teaches us that every mother tongue in the world is important. And this was endorsed by the General Assembly of UNESCO in 1999, which decided to observe February 21 as International Mother Language Day.

On November 11, 2021, "The UNESCO Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Prize for the Creative Economy" was introduced by the UN. The decision was taken at the 210th meeting of UNESCO's Executive Board. This announcement of an award by a world organization for young entrepreneurs during the Mujib Centenary has greatly encouraged and motivated us all.

Earlier, the impact of Mujib's philosophy on future generations was highlighted by the UNESCO Director-General Ms Audrey Azoulay's message on Bangabandhu's 45th death anniversary. In her words, "It is certain that Bangabandhu's legacy will continue to be a great source of inspiration for

generations to come and for those working to reinvent the world. The Unesco shares this aspiration for an inclusive, equitable, and democratic society–a dream that Bangabandhu presented on March 7, 1971, in a historic speech now inscribed on Unesco Memory of the World International Register."

Previously, on October 30, 2017, UNESCO's 10th Director-General Irina Bokova announced the inclusion of Bangabandhu's historic March 7 speech in UNESCO's list of world documentary heritage (Memory of the World International Register). The organization started documenting significant heritage markers of world civilization. This program aims to preserve world heritages and make them accessible to future generations.

The March 7 speech by Bangabandhu, who was once dubbed by the international magazine Newsweek as the "poet of politics," is indeed an epic verse of politics. If the goal of politics is the welfare of the people, then achieving and maintaining freedom will be the highest form of public welfare. Bangabandhu's 7th March speech is epic in its encapsulation of the spirit of liberation for the Bengali nation.

Speaking of Bangabandhu's historic speech, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina said, "This speech of 7th March in the final phase of the freedom struggle united the entire nation against the colonial rule of Pakistan. Inspired by this hypnotic speech of the father of the nation, the Bengali nation started preparing for the armed liberation war. This unique speech of 7th March became the main motto of our liberation war."

In this speech of Bangabandhu, the eternal truth of human emancipation was emphatically revealed, and the momentum of the journey to the path of light leaving behind the darkness was created. The relevance of this speech of Bangabandhu will remain forever because the liberation of Bengalis and human liberation is a fundamental truth for human civilization to progress.

In the edited book, "We Shall Fight on The Beaches," historian and writer Jacob F. Field catalogues Bangabandhu's 7th March speech among the 41 speeches that moved the whole world. The book contains some remarkable speeches from 431 BC to 1987 AD that made a lasting impact on human civilization.

The address by Bangabandhu, the greatest Bengali of all time, on March 7 is a glorious example of how a speech can transform unarmed Bengalis into an armed race and liberate

a subjugated people to become an independent nation. Reflecting on the scene of the race-course field where the speech was delivered, The Daily Ittefaq on the following day March 8 ran a headline: "The Raving-Roaring Waves". The report observed, "March 7 is an unforgettable day. The historic racecourse ground became unique and unforgettable. This became a conference of the great hero of Bengal's independence movement, Sheikh Mujibur Rahman, and his commanding freedom-loving soldiers. The Bengali people are resilient and unsurmountable."

On the same day, the now-defunct Dainik Pakistan carried the headline "The Thundering Oath of Millions" to narrate : "Millions of hands were raised in the sky all taking thunderous oaths. The people have awakened, and in their hands were the ultimate symbols of resistance of the seven-crore people—bamboo poles. Such was the scene of the historic meeting of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at Ramna Race Course Maidan on Sunday (March 7, 1971)."

In the late night edition on March 8, 1971, The Daily Ittefaq, bore the headline, "Victory to People" for its report, saying, "The military authorities have finally agreed to allow the full details of Sheikh Mujibur Rahman's Ramna Race Course speech to be broadcast by Dhaka Radio. On Monday (March 8, 1971) at 8:30 a.m., the speech delivered by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at the Ramna Race Course will be broadcast from the Dhaka Radio Centre. It will also be relayed from other radio centres of Bengal."

For 21 years, the killers of Bangabandhu and their accomplices did not let this speech of Bangabandhu be published or aired even once. Bangladesh Television broadcast this speech for the first time on the evening of June 23, 1996, twenty-one years after the assassination of Bangabandhu.

The Pakistani rulers stopped the radio and television broadcasts of the Bangabandhu rally when he was giving his speech on the afternoon of March 7, 1971. The Daily Azad retorted by saying, "Radio Silence of Dhaka Radio": "Dhaka Betar Kendra suddenly went silent yesterday (Sunday). This centre has not aired any program since 3:15 PM. When will this centre be opened again? None of the concerned parties could inform."

"Bangabandhu's race course speech was supposed to be broadcast on the radio yesterday. Arrangements were made accordingly. When Bangabandhu ascended the lectern at the racecourse, the song 'Amar Sonar Bangla, Aami Tome Laam'

was played. But once the leader's speech started, the broadcast was stopped by a certain group of people. Thereafter, Sheikh Mujibur Rahman called upon the Bengali radio staff to start non-cooperation from Race-course Ground. Immediately the employees abandoned their duties and came down to the streets and the radio also went dead" (Azad, 8 March 1971).

That very evening, the president of Gono Oikya Movement, retired air marshal Asghar Khan, told a press conference, "All the measures taken by Sheikh Mujib are reasonable; as the head of the largest party of the majority representative, Sheikh Mujib has the right to rule the country."

Because of the role and significance of this speech behind the independence of Bangladesh, this historic speech is part of our constitution following the fifteenth amendment.

The speech of March 7, 1971, given by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, fifty years ago today, is a wonderful case of the application of communicative theory. Amazing maintenance of the modern rules and regulations of communication is available in this historic speech.

At an average of 58 to 60 words per minute, Bangabandhu completed this epic speech in 19 minutes. A standard estimate in broadcasting is 60 words per minute. In this speech of 1,107 words, there is no boring repetition, no extravagance - there is only the gist, the essential core message. But the repetition in a couple of places added to the momentum and the implicit message.

The opening gambit is very significant. They say, "There is nothing like a good beginning for a speech." It is important to take the emotional orientation of the listener as well as the reference to the audience and reference to recent happenings into consideration. These ideas of communication theory are evident in this groundbreaking speech of Bangabandhu.

Bangabandhu began the speech, "My brothers, I appear before you today with a heavy heart. You know and understand everything. We tried with our lives. But the sad thing is that today in Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi, and Rangpur the streets are stained with my brother's blood. Today the people of Bengal want freedom, the people of Bengal want to live, the people of Bengal want their rights." The speech is highly effective in outlining the main issues and foreshadowing the content allowing the audience a glimpse of what is to come.

A thorough analysis of the entire speech shows that the speech is a declaration and description of the emergence of a new country on the map of the world, declaring a natural end to the eastern part of the state structure of Pakistan.

This speech of March 7 is the motto and principle of Bangladesh's independence. During the nine months of the liberation war, this speech was our battle cry. Children-teenagers-young-old people would get goosebumps on hearing this speech. The voiced-out speech of Bangabandhu not only united seven-and-a-half-million Bengalis but also inspired them to join the liberation war within 18 days. After all, this speech was practically the de facto declaration of independence of Bangladesh.

Bangabandhu said, "I don't want the prime ministership!" The late journalist-and-editor Kamal Lohani reflected on this statement of Bangabandhu to claim, "Because Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman could show such a strength vis-a-vis parliamentary politics, he became the founder of a nation-state and liberator of its people."

He applied the appropriate "speech idioms" pertinent to communication theory. The speech appears like a conversation between an undisputed leader and his people on the eve of the birth of a country. This speech, written immediately in a very simple and fluent language, is the main document of our freedom. The diction he follows is successful in attracting the audience. He raised questions at various stages of the speech. In particular, he raised five specific questions: What did I do wrong? What did we get? What is a Round Table Conference? Whom will I sit with? Will I sit with those who have shed the blood of my people?

The "ask a question and then answer" method applied here established a link between the speaker and the listener. The logical use of the present tense throughout the speech gives liveliness to the speech. Again, in a conversational tone, he has made a beautiful combination of past and future in this speech.

In the parts of the speech, where Bangabandhu has given commands, instructions, or warnings, the sentences are naturally shortened. After much research, communication theorists now promote the use of short declarative sentences, which we find in Bangabandhu's speech. Some examples can be given from speeches. For example, "On the 28th, the employees will go and collect their salaries"; "build a fortress in each house"; "I am telling government employees: you

must obey whatever I say"; "Until the country is freed, no one will pay any rent or tax"; "Seven and a half crore Bengalis cannot be kept in check".

The essential characteristic of a statesman-like and authoritative speech is not only to acquaint the audience with future initiatives and action plans but also to inspire and motivate them to actively participate. Bangabandhu accomplished the task very successfully through his speech. Bangabandhu's encouraging speech, "I request you, build a fort in every house. You must fight the enemy with all you have, and all the roads of life you have, you will close unless I give the order." Seven-and-a-half-million Bengalis accepted this speech both as a revelation and a decree.

The humane side of Bangabandhu's character adds another dimension to the speech. His speech on 7th March is the best proof that his human kindness never wavered even when issuing dire warnings. Standing at the crossroads of the birth and death of a state, he said "We will kill you with rice; we will kill you with water;" and immediately uttered a reassurance: "You are my brothers, stay in the barracks, no one will tell you anything. But don't try to shoot us in the chests anymore." The generous-hearted Bangabandhu had both his harsher and gentler sides.

The inclusion of relevant facts made the speech informative while the use of sharp reasoning offered a strong motivational message to the audience. In the words of Bangabandhu, "He bought weapons with my money to protect the country from the attack of foreign enemies. Today those weapons are being used against the suffering masses of my country. They are being shot in the chest. We are the majority in Pakistan, but whenever we Bengalis have tried to claim power, they have pounced on us." The presentation of hard reality in plain language is an inherent feature of Bangabandhu's speech. In communication theory, the opening statement is often expanded or repeated in the middle of a speech for effective emphasis. This too is evident in Bangabandhu's speech. In the middle of the speech, he said, "I said to him, Mr Yahya Khan Sahib, you are the President of Pakistan. See how my poor people, my Bengali people have been shot in the chest. How the laps of my mothers have become empty? How are these people killed? You come, see, and judge."

Bangabandhu duly followed the rule of "put up the attribution first" in quoting others. He first mentioned the speaker's name

before introducing his comments. For example, “Mr Bhutto said, he will not go” or “Mr Yahya Khan took over the government. He said, ‘I will give the country a constitutional governance; will give democracy—we accepted.’” etc. One major objective of public discourse is to have an agenda-setting function, which is overwhelmingly evident in Bangabandhu's speech. Bangabandhu's ‘humanistic approach’ did not change even when imposing a strict political program. The following statement is a case in point: "I want to state in clear letters that from today the high court, lower courts, criminal courts and educational institutions in Bangladesh will be closed for an indefinite period. So that the poor do not suffer, so that my people do not suffer, all the other things will be out of the purview of the strike. Rickshaws, horse carriages will run; trains will run; launches will run. But the Secretariat, Supreme Court, High Court, Judge Court, Semi-Government Offices like WAPDA will not operate."

An important provision in public communication is the status conferral function. The application of this provision can be observed in various parts of Bangabandhu's speech. For example, he said, “And the salaries of all the labour brothers who joined this seven-day strike will be delivered to them by the owners of every industry,” or “And all the people who have been killed, injured, we will try to help them as far as we can on behalf of the Awami League.”

A well-known technique for effective results in public speaking and public communication is posing a challenge. When Bangabandhu came to the end of the speech, he said, “In every village, in every neighbourhood, build a council for resistance under the leadership of the Awami League and be prepared with whatever you have. Remember, when we have learned to give blood, we will be ready to give more blood–and we will free the people of this country, inshAllah!” This exemplifies how he has engrossed his audience with his skilful and artful speech informed by communication theory.

Recent developments in communication theories recommend the placement of the defining segment toward the end of any speech. The last sentence of Bangabandhu’s March 7 speech : “The struggle this time is for our liberation. The struggle this time is for the struggle of independence,” defines the core action. The communication textbook prescribes, ‘Don’t drag out your conclusion’. We often end a speech by saying, ‘finally’, ‘in the end,’ or ‘in conclusion’. In this historic speech, Bangabandhu’s application of speech definition follows the

modern theory of communication, which was unimaginable fifty years ago.

In his speech on June 4, 1940, British Prime Minister Winston Churchill (1847-1965) said, “We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.” In this context, “we shall fight” is the definitive message.

In the same way, Martin Luther King (1929-1968) in the USA presented a historical speech on 28 August 1963, where the definitive message was “I have a dream.” Here is an excerpt of the speech : ‘I have a dream that one day this nation will rise and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the colour of their skin, but by the content of their character.”

In the Gettysburg Address, delivered on November 19, 1863, by the 16th President of the United States, Abraham Lincoln (1809-1865) forwarded the definitive message when he said, “and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth”. The same goes for “A tryst with destiny” part of the midnight speech of India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964) on August 14-15, 1947.

We know that a powerful speech is usually brief. The eloquent speech delivered on March 7, 1971, by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is a glorious example. The way it inspired a nation to participate in a war of liberation is rare. The speech is a ‘gold mine’ for researchers who want to analyse various directives and directions of our liberation war and independence. In many ways this speech is groundbreaking. Hence, this historical speech is now studied by various public speakers, researchers, and communicators at home and abroad. The clarity of thought, sophistication of articulation, and ideological convictions make it a great public address.

One can recall Dale Carnegie in this context. He said, “The best argument is that which seems merely an explanation.” The best logic is the best explanation. The clear explanation of the events of its time makes this speech plausible for all time.

Despite its extempore nature, Bangabandhu's historic speech on March 7 is devoid of boring repetition, momentary

hesitations and so on. It is only possible for Bangabandhu to deliver such a spontaneous and instructive and at the same time poetic speech. It just solidifies Newsweek's estimation of him as the 'poet of politics' as mentioned in its cover article published on April 5, 1971. This speech was a revolution, which resulted in our great liberation war and ultimate freedom. His style and diction are marvellous, to say the least.

Bangabandhu's speech reminds us of the famous speech of the third president of the United States, Thomas Jefferson (1743-1826), who said, "the most valuable of all talents is that of never using two words when one will do." This speech of March 7, 1971, is not only the best speech in the Bengali language but also one of the most unique speeches in the world. Because at the core of this speech lies the declaration of our independence and motivation for our liberation war.

This speech will keep the Bengali nation alive like a spark for ages. It will show the way to understand the truth of life, and will give political direction for future movements for freedom. According to Selina Hossain, "Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the great man of history, who is not created by time; rather, he brought time with him in his palm." The history that Bangabandhu has created will show the way of liberation for Bengalis for ages.

The questions of freedom in the quote from Rabindranath Tagore used as an epigram in this article, which the poet-sage wrote one hundred and seventeen years ago, have been answered by Bangabandhu in his March 7 speech. The enlistment of the speech by UNESCO thus accelerates the ongoing journey of human liberation with the added accent of Bangabandhu. Let us be pledge-bound to build an all-encompassing free society of Bangabandhu's dream.

References

-UNESCO website

- 'Bangabandhu's 7th March speech: an epic of politics', Department of Information and Communication Technology, Dhaka, 2017.

- 'Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's Struggle for Liberation and Struggle for Freedom', Bangabandhu Fine Arts Academy, Dhaka, 2018

-Contemporary newspapers and periodicals

-*We Shall Fight on The Beaches*, Jacob F Field (ed.), Michael O' Mara Books Limited, London, 2013

৭ই মার্চ : বাঙালির ইতিহাসের বাঁকবদলের দিন

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

মার্চ মাস বাংলাদেশের জন্ম মাস–বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার মাস। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালির ইতিহাসের বাঁকবদল ঘটে গিয়েছিল। চর্যাপদের আবিষ্কার থেকে যদি হিসাব করি তাহলে বাঙালির ইতিহাস হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। এই সময়কালে জাতি হিসেবে নিজেদের প্রাতিস্বিকতা জানান দিতে গিয়ে বাঙালিকে নানামুখী সংগ্রাম করতে হয়েছে। আন্দোলন, সশস্ত্র বিদ্রোহ কী নেই বাঙালির ইতিহাসে–এমনকি বিপ্লবীদের তালিকায়ও স্মরণীয় বহু নাম আছে। কিন্তু এসবের কোনোটাই ঐক্যবদ্ধ বাঙালির সংগ্রাম বা আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ছিল না বরং ঘটমান বিদ্রোহ বা আন্দোলনের পেছনে কাজ করেছে কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষের অসন্তোষ এবং এর রূপ ছিল অঞ্চলভিত্তিক। কখনো ধর্মীয় বাতাবরণে, কখনো জমিদার ও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের আকারে এসবের প্রকাশ আমরা দেখি। অধিকন্তু বলা যায়, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে তৎকালে সৃষ্ট বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভেতরে যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে, তাও স্বাধীনতার চেতনা ছিল না, বরং তা ছিল স্বাধিকার ও স্বাজাত্যবোধের চেতনা। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ভাষা, সংস্কৃতি ও দূরত্বের নিরিখে অস্বাভাবিক হলেও পূর্ব বাংলার বাঙালিরা পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোয় থিতু হতে চেয়েছিল। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের অন্য অঞ্চলের বাঙালিরা সর্বভারতীয় কাঠামোয় খুঁজে নিয়েছিল নিজেদের অবস্থান।

দুই

পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মনে অসন্তোষের প্রথম প্রকাশ ঘটে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। মূলত যার শুরু ১৯৪৮ থেকে। ভাষার মর্যাদার প্রশ্নে এই আন্দোলনের বাহ্যিক স্ফুরণ হলেও এর গভীরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এই দুটো অঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নও নিহিত ছিল। তারপর আন্দোলন যে পথে অগ্রসর হয়েছে তার মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফাতেও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিই ছিল মুখ্য। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছিলেন।[১] ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনি কমিটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি বাঁক, বলা যেতে পারে একটা যুগান্তর ঘটে গেল এই ৬ দফায়। প্রথমবারের মতো ফেডারেল কাঠামোয় প্রাদেশিক শাসনের সুস্পষ্ট দাবি সন্নিবেশিত হলো, যার ভেতরে প্রচ্ছন্ন ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। এ জন্যই ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ নামে অভিহিত করা হয়। তখন আইয়ুব

খান ভীত হয়ে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়েরের মূল কারণ এটাই। ১৯৭০ সালের অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মানুষ এই ৬ দফার ডাকেই সাড়া দেয়। স্বাধীনতার প্রশ্নটি তখনো সামনে আসেনি। এই নির্বাচনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বাঙালির চূড়ান্ত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা সমস্ত পরিস্থিতি পাল্টে দেয়, জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সারা বাংলায় মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তখনই স্বাধীনতার দাবি সামনে আসে। এতদিন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও স্বশাসনের দাবিতে মুখর ছিল তাতে বোনা হয় স্বাধীনতার স্বপ্ন। ৭ই মার্চের জনসভাকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ছাত্র-জনতার স্বাধীনতা ঘোষণার চাপও বাড়াতে থাকে। আমরা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার কাছে শুনেছি এই কঠিন সময়ে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'তোমার চেয়ে বাংলার মানুষকে ভালো কে জানে। তোমার মন যা চায় তুমি তাই বলবে।' একদিকে নানা জল্পনা-কল্পনা, অন্যদিকে পাকিস্তান বাহিনীর সামরিক প্রস্তুতি–যেন অঘোষিত এক যুদ্ধাবস্থা।

এই অনিশ্চিত, কঠিন ও অগ্নিগর্ভ সময়ে ৭ই মার্চের বিকেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেসকোর্স মাঠের মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কথা শোনার অপেক্ষায় লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত। আর রেডিওর সামনে বসে সারা দেশের কোটি কোটি মানুষ। প্রতীকী অর্থেও যদি বলি সেই বিকেলে কিছু সময়ের জন্য থমকে গিয়েছিল বাঙালির ইতিহাস–কী বলবেন বঙ্গবন্ধু? কালো মুজিব কোট আর সাদা পাঞ্জাবি পরা বঙ্গবন্ধু সাদা কাপড়ে ঢাকা টেবিলে চশমাটা রেখে দরাজ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'ভাইয়েরা আমার ...', তারপর একে একে উনিশ মিনিটের বজ্রনির্ঘোষে যা বললেন তাতে বদলে গেল বাংলার ইতিহাসের গতিপথ। তাঁর বক্তৃতার প্রতিটি বাক্য যেন মহাকাব্যের একেকটি অধ্যায়। 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না', 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল', 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব', 'এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ'–এ রকম অনেক স্মরণযোগ্য, উদ্দীপনাময়, সাহসী উচ্চারণে অভূতপূর্ব ছিল সেই ভাষণ। ভাষণের শেষদিকে বঙ্গবন্ধু যখন ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'–তৎক্ষণাৎ ভেঙে পড়ল পাকিস্তানি শাসনের দুর্গতোরণ। এতকাল বাঙালি লালন করেছে স্বাধিকার ও স্বশাসনের স্বপ্ন, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মতো সেখানে আছড়ে পড়ল স্বাধীনতার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। বাঁকবদল ঘটে গেল বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে। বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করল কীভাবে একটি বজ্রকণ্ঠ ও একটি তর্জনী একসূত্রে গেঁথে ফেলেছে সর্বকালের বাঙালিকে। কীভাবে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে সঞ্চারিত হলো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়। তখন থেকেই বাঙালি স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সংগ্রাম থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে উজ্জীবিত হলো বাঙালি। সেদিন রেসকোর্স ময়দানের মঞ্চে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন জাতির প্রতীক। জাতি কথা বলেছে তাঁর কণ্ঠে। সে জন্যই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব'–এই কালজয়ী উচ্চারণ।

তিন

পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার ভাষণ এটি এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ ভাষণ। এই ভাষণ পৃথিবীর ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অভিষিক্ত করেছে Poet of Politics বা রাজনীতির কবির মর্যাদায়। এ ভাষণে ইতিহাস চেতনা, আত্মত্যাগ, স্বাধীনতার আহ্বান ও যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল এক সূত্রে গাঁথা।

শেখ হাসিনা লিখেছেন :

> বিশ্বের বিখ্যাত যত ভাষণ বিশ্ব নেতারা দিয়েছেন, সবই ছিল লিখিত, পূর্ব প্রস্তুতকৃত ভাষণ। আর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিত বক্তৃতা। এই ভাষণ ছিল একজন নেতার দীর্ঘ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও আগামী দিনের কর্ম পরিকল্পনা। একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি। যে যুদ্ধ এনে দিয়েছে বিজয়। বিজয়ের রূপরেখা ছিল এ বক্তৃতায় যা সাত কোটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ছিল ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা।[২]

এই ভাষণের আরেকটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো এর মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু' পরিণত হলেন সার্বভৌম একজন নেতায়। ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব সৃষ্টি হয় নেতার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে; ক্ষমতায় নয়, অন্যদিকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সৃষ্টি হয় স্বাধীনতায়। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখন থেকেই বাংলাদেশ সার্বভৌম রাষ্ট্র। তার পূর্বে বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় ছিলেন না কিন্তু ছিলেন জাতির মুকুটহীন রাজা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মার্চের ২ তারিখ থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন–বস্তুত তখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সবকিছু তাঁর নির্দেশে চলছিল। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে অসহযোগ আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ পেল। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি, প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমি এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্টকাছারি, আদালত, ফৌজদার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে...সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজ কোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো–ওয়াপদা কিছু চলবে না।' সেই সঙ্গে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে বেশ কিছু নির্দেশনা দিলেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' তাঁর এসব নির্দেশ ছিল সুস্পষ্ট।

সর্বস্তরের জনগণ নেতার নির্দেশ পালন করেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। পরবর্তী সময়ে ৩৫টি নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। জাতি এসব নির্দেশও অনুসরণ করেছে ঐক্যবদ্ধভাবে। কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের সকল কর্তৃত্ব চলে গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাতে। অচল হয়ে পড়েছিল সরকার। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামে এ ধরনের সার্বভৌম নেতার আবির্ভাবের উদাহরণ পৃথিবীতে নেই।

চার

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ ছিল অত্যন্ত কৌশলী এক ভাষণ। একদিকে পাকিস্তানি বাহিনীর রণপ্রস্তুতি ও গণহত্যার হুমকি, অন্যদিকে নেতার ওপর জনগণের অপরিসীম প্রত্যাশা।

তিনি কি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন যাকে বলে UDI ev Unilateral Declaration of Independence? না অন্য পন্থা অবলম্বন করবেন? এই প্রশ্ন তখন সামরিক ছাউনি, কূটনৈতিক পাড়া ও দেশের সর্বত্র। স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য তাঁর ওপর তখন বিভিন্ন মহলের প্রবল চাপ। সে সময়ের পরিস্থিতি বোঝার জন্য আমি ২৫শে মার্চের গণহত্যার নীল নকশাকারীদের অন্যতম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার *A Stanger in My Own Country: East Pakistan 1969-1971* থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> In case Sheikh Mujib attacked the integrity of the country and proclaimed the Universal Declaration of Independence, I would discharge my duty without hesitation and with all the power at my command. I would have the army march in immediately with orders to wreck the meeting, and, if necessary, raze Dhaka to the ground.[3]

সাধারণত বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণকে তুলনা করা হয় কয়েকটি বিখ্যাত ভাষণের সঙ্গে যেমন; আমেরিকার গৃহযুদ্ধে নিহতদের স্মরণে আব্রাহাম লিংকনের Gettisburg Address, চার্চিলের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ভাষণ We shall Fight on the Beaches এবং মার্টিন লুথার কিংয়ের I have a Dream ভাষণের সঙ্গে। প্রথম দুটি যুদ্ধকালীন প্রদত্ত, তৃতীয়টি ছিল নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত। কিন্তু এসব ভাষণের সময় জনসভাস্থলে আক্রমণ করার জন্য কোনো বাহিনী, ট্যাংক, কামান প্রস্তুত করে রাখা হয়নি। বঙ্গবন্ধু যে ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জাতিকে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন এরকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। সে জন্যই সার্বিক বিচারে এই ভাষণ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ ভাষণ। তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর মধ্যে এক ধরনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়–বক্তব্যের, দৃঢ়তায়, তীব্রতায় ও ভাষার সম্মোহনী শক্তিতে। যেমন চার্চিল তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন ১৯৪০ সালে হাউজ অব কমন্সে। তিনি বলেছিলেন, 'whatever the cost may be we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills'–আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব...আমরা যখন মরতে শিখেছি, কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে উৎসাহিত এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু জাতির অন্তরাত্মাকে আবিষ্কার করেছিলেন। একদিকে জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক ও নির্দেশনা দিয়েছেন, অন্যদিকে রক্তপাত এড়িয়েছেন, আলোচনার পথ খোলা রেখেছেন যাতে বিশ্ববাসী তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী না ভাবে। কৌশলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন তবে সেটি UDI ছিল না। বাঙালি সময় পেয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার। অন্যদিকে বিশ্ববাসীও বুঝেছে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী নন, স্বাধীনতাকামী। পাকিস্তানের বাঙালির ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিচ্ছিন্ন হলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা হবে, বাঙালির নয়। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু

সচেতন ছিলেন। বিখ্যাত 'Newsweek' পত্রিকার সাংবাদিক লরেন জেনকিন্সকে তিনি বলেছিলেন, 'A month ago, at a time when he was still publicly refraining from proclaiming independence, Mujib privately told Newsweek's Loren Jenkins that there is no hope for solving the situation. The country as we know it is finished but he waited for president Mohammed Yahya Khan to make the break. We are the majority, we cannot secede: they the westerners, are the minority, and it is up to them to secede.'[৪]

আমরা জানি ১৯৬৭ সালের ৩০শে মে লে. কর্নেল উজুকুর নেতৃত্বে নাইজেরিয়ার বায়াফ্রা প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল কিন্তু তারা বিশ্ববাসীর স্বীকৃতি পায়নি। অধিকাংশ দেশ উজুকুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেয়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত বায়াফ্রা স্বাধীন থাকলেও পরে বাধ্য হয়েছে নাইজেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকতে। নাইজেরিয়ার বিখ্যাত লেখক চিনুয়া আচিবি এ নিয়ে There Was a Country নামে একটি বই লিখেছেন। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু যদি প্রজ্ঞা ও কৌশলের পরিচয় না দিতেন, যদি তাৎক্ষণিক আবেগতাড়িত হয়ে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন, তাহলে আমাদের ইতিহাসও হয়তো বায়াফ্রার মতো হতো।

পাঁচ

এই ভাষণের তাৎপর্য ব্যাপ্তি ও মহিমা আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। এটি আজ সকল মুক্তিকামী মানুষের ভাষণ। ২০১৭ সালে ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্যের (World's Documentary Heritage) অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে The memory of the world international register-এর তালিকাভুক্ত করেছে। যেসব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অসীম বৈশ্বিক তাৎপর্য আছে সেগুলোই এই আন্তর্জাতিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসংক্রান্ত এক পত্রে ইউনেস্কো জানিয়েছে যে এই রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ৭ই মার্চের ভাষণের ব্যতিক্রমী গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে এবং এর তাৎপর্য হচ্ছে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে এই ভাষণকে সংরক্ষণ করা। এই ভাষণ এখন চিরায়ত ভাষণ–প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হবে এই ভাষণের অনন্য ও উদ্দীপনাময় বক্তব্যে। বস্তুত এই ভাষণই মার্চ মাসকে পরিণত করেছে বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের জন্ম মাসে–আমাদের স্বাধীনতার মাসে।

তথ্যসূত্র

১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউপিএল, ঢাকা ২০২২, পৃ. ২৯৪
২. শেখ হাসিনা, 'ভাইয়েরা আমার', দেশ, কলকাতা, ২০১৯
৩. Khadim Hossain Raja, *A Stanger in My Own Country: East Pakistan 1969-1971,* Oxford University Press, Lahor 2012, p. 62
৪. নিউজউইক, ৫ই এপ্রিল ১৯৭১

৭ই মার্চ ভাষণের সূত্র ও সুর

সৌমিত্র শেখর

১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স, বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাৎক্ষণিক শব্দচয়নের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি ছিল অসাধারণ এবং আজ তা বিশ্ব-ঐতিহ্যের অংশ। সাধারণ মানুষকে জাগাতে ভাষণে তিনি যে আবেগ, যুক্তি, রাজনৈতিক পথপ্রদর্শন ও শব্দমালা প্রয়োগ করেছিলেন, সে-জন্য ভাষণটির ভিন্নমাত্রা সৃষ্টি হয়। এই মহাভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে হাজার বছরের বঞ্চনা, অপমান ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ছিন্ন করতে ডাক দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এই ভাষণ। তাৎক্ষণিক হলেও এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীকে কোনোরূপ সম্বোধন না করে নিজের দুঃখভারাক্রান্ত মনের কথা বলে পরোক্ষভাবে তাদের হৃদয়রাজ্য জয় করে নেন। এরপর তিনি দেশের সামগ্রিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতারা কী বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও তাঁকে যে ক্ষমতাগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়নি, সে প্রসঙ্গ তুলে ধরে জনগণের ওপর এর বিচারের ভার দেওয়া হয়; তিনি সামরিক আইন প্রত্যাহারের জন্য দৃঢ় দাবি তোলেন; পাকিস্তানিদের আগ্রাসনের স্বরূপ তুলে ধরে তা প্রতিহত করার জন্য তিনি বাঙালিদের আহ্বান জানান; দাবি আদায় না হওয়া অবধি তিনি বাঙালিকে হরতাল-অবরোধ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দান করেন; সবশেষে তিনি তাঁর এই সংগ্রামকে মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে ঘোষণা দেন, যার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে ২৬শে মার্চ, ১৯৭১।

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ কোনো ধর্মীয় বা 'মোটিভেশনাল' বক্তৃতা ছিল না, ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভাষণের তালিকা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫৮৮ সালে স্পেন ও ইংল্যান্ডের যুদ্ধ সামনে নিয়ে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে রানি এলিজাবেথের ভাষণ থেকে শুরু করে ১৯৪২ সালে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভাষণ, ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে প্রদত্ত রুজভেল্টের বক্তৃতা, ১৯৬৩ সালে দেওয়া মার্টিন লুথার কিংয়ের 'আই হ্যাব অ্যা ড্রিম' ভাষণ, ১৯৬৪ সালে নেলসন ম্যান্ডেলার আত্মপক্ষ সমর্থন করে দেওয়া আদালতের বক্তৃতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ইতিহাসের যে-সব নায়ক ও রাষ্ট্রনায়কদের কথা জানি, তাঁরা সে ভাষণ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর মতো কোনো জনসমুদ্রের সামনে নয়। প্রায় দশ লক্ষ মানুষকে সম্মুখে রেখে সেদিন তিনি তাঁর এই ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ভাষণকেই ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। ভাষণটির স্বীকৃতিস্বরূপ মেমরি অব দ্য

ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে (এমওডাব্লিউ) তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এমওডাব্লিউ-তে বাংলাদেশি দলিল হিসেবে এটাই প্রথম স্বীকৃতি পেল।

ভাষণটি লিখিত ছিল না, এটি ছিল সম্পূর্ণভাবে তাৎক্ষণিক। এই ভাষণ প্রদানের আগে-পরে নানা ঘটনা ঘটেছে। বিশেষত, ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন; ২রা মার্চ বঙ্গবন্ধু এই সিদ্ধান্ত না মানার ঘোষণা দিয়ে ৭ই মার্চ রেসকোর্সে গণজমায়েতের ডাক দেন; ৩রা মার্চ সারা দেশে তিনি হরতাল ডাকেন ইত্যাদি। ৭ই মার্চের আগে প্রতিটি দিন ছিল নাটকীয় এবং ঘটনাবহুল। এ সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা কিছু ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন এবং বলেছেন, তখন অনেক ছাত্রনেতা, যেমন–সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদসহ অনেকে ৩২ নম্বরে এসেছেন। সিরাজুল আলম খান খুব জানাতে চাইছিলেন, যেন ৭ই মার্চেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণাটা দিয়ে দেন। সেই সময় অনেক বুদ্ধিজীবী লিখতেন, বঙ্গবন্ধুকে পয়েন্ট দিয়ে যেতেন আবার কেউ পরামর্শ দিয়ে যেতেন যে কী করে কী করতে হবে, কী বলতে হবে। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন; একটা কথা বারবার তাঁর কানে বাজে, যেটি বঙ্গবন্ধু সিরাজুল আলম খানকে বলেছিলেন এবং তা হলো : কী করতে হবে আমি জানি। তোমরা তোমাদের কাজ করো। যাও। বঙ্গবন্ধুর এই কথার মধ্যেই ঐতিহাসিক ভাষণটি সম্পর্কে তাঁর চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, এই ভাষণের প্রতিটি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর অভিজ্ঞতা আর সিদ্ধান্ত থেকে। শেখ হাসিনার বক্তব্যে আর একটি তথ্য পাওয়া যায়, সেটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে বঙ্গবন্ধু শুধু জীবনসঙ্গিনী হিসেবেই নয়, রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গিনী হিসেবেও মর্যাদা দিতেন। এই ভাষণের প্রাক্কালেও সে প্রমাণ পাওয়া যায়। শেখ হাসিনা বলেছেন, ৭ই মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধু যখন দিতে যাবেন, তখন বঙ্গমাতা একটাই পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তাহলো : 'সারাটা জীবন সংগ্রাম করেছ তুমি। তোমার মনে যেই কথা আছে, তুমি ঠিক সেই কথাটাই বলবে। কারও কথা শোনবার তোমার প্রয়োজন নাই।' বঙ্গবন্ধুও জানতেন, প্রতিটি সংগ্রামের ক্ষেত্রে, আন্দোলনের সময়টা পরিমিতিবোধ থাকতে হয়। সেটি মেনেই তিনি ৭ই মার্চের ভাষণ দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন বিশ্বমাপের কূটনীতিবিদের মতো সেদিন প্রায় দশ লক্ষ মানুষের সাগরে নিজের ভাষণ দিয়েছিলেন। সাধারণ রাজনৈতিক নেতা হলে তিনি হয়তো খেই হারিয়ে ফেলতেন। তিনি আবেগের তীব্রতা নিয়ে বলেছেন, পাকিস্তান আমলের গত ২৩ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস। এই ইতিহাস মানুষ তাদের জীবন দিয়ে যেহেতু উপলব্ধি করেছে, তাই সহজেই সেটি গ্রহণ করেছে। তিনি '৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ সালের আইয়ুব শাহীর সামরিক শাসন, '৬৬ সালের নিজের দেওয়া ছয় দফা, '৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, '৭০ সালের নির্বাচনসহ সে-সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একনজরে

বলে গেছেন। এটি এক অসাধারণ মুখবন্ধ! হঠাৎ-বক্তৃতার এমন চমকপ্রদ মুখবন্ধ সারা বিশ্বেই বিরল।

এরপর বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চ থেকে ৬ই মার্চে রাজনৈতিক পর্দার অন্তরালে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনার চুম্বক উল্লেখ করেন। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যে রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, বক্তৃতায় তার প্রমাণসহ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালনের কথাও তিনি বলেন। এরপরেই বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়া বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে : 'কী পেলাম আমরা?' ৭ই মার্চের ভাষণে এখান থেকে ক্লাইমেক্সের সূচনা। তিনি বলেছেন, বাঙালির টাকায় অস্ত্র কিনে পশ্চিম পাকিস্তানিরা তা ব্যবহার করে বাঙালির বিরুদ্ধে। সংখ্যাগুরু হয়েও বাঙালিরা অধিকার-বঞ্চিত। ইয়াহিয়া খানের গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধুর আবার হুঙ্কার : 'কীসের বৈঠক বসবে, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসবো?' বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠের সুর ও ভঙ্গিতে বোঝা যায়, তিনি এসব প্রত্যাখ্যান করছেন। এবার তিনি তাঁর ঋজুতা প্রকাশ করেন এবং বলেন : শহিদের রক্তের ওপর দিয়ে তিনি এসেম্বলিতে যোগদান করবেন না। শুধু তাই না, ঘোষণা দেন : প্রধানমন্ত্রিত্ব নয়, তিনি এ দেশের মানুষের অধিকার চান। এ দেশ বলতে তিনি কিন্তু বুঝিয়ে দেন যে, এটা মূলত বাংলাদেশের। এরপর ভাষণে আরও তীব্রতা : একেবারে অসহযোগ; পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভাতে মারার হুঁশিয়ারি! কিন্তু সব কিছুর নেতৃত্ব যেন আওয়ামী লীগের হাতে থাকে, এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ পরিমাণে সজাগ। তিনি বলেন, স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে এবং সেটি 'আওয়ামী লীগ'-এর নেতৃত্বে। এই নেতৃত্ব নির্দেশ করেই বঙ্গবন্ধু 'জয় বাংলা' বলে স্বাধীনতার ডাক দেন।

এই ভাষণে কিছু শব্দ আছে যা বেশ পুরোনো, কারও মতে বেশ সামন্ততন্ত্রীয়। যেমন, 'গদি' : (আমরা গদিতে বসতে পারি নাই); 'গোলাম' : (আমাদের গোলাম করে রেখেছে); 'হুকুম' : (আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি); 'মায়নাপত্র' : (মানুষ তাদের মায়নাপত্র নিবার পারে) ইত্যাদি। এগুলো কিন্তু পুরোনো বা সামন্ততান্ত্রিক মনে হলেও এখানে আছে গণ-সম্পৃক্ততা। বঙ্গবন্ধু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত বাঙালিদের সঙ্গে জন-সংযোগ সৃষ্টির জন্য ইচ্ছে করেই তাদের সমাজে ব্যবহৃত এমন শব্দ নির্বাচন করেছেন। এমনকি, ক্রিয়াপদে 'দিবার', 'নিবার' ব্যবহারও এই নিরিখে বিচার্য। তাই 'গদি'-র বদলে 'রাষ্ট্রক্ষমতা', 'গোলাম'-এর 'ভৃত্য', 'হুকুম'-এর বদলে 'নির্দেশ', 'মায়নাপত্র'-এর বদলে 'বেতনভাতাদি' বললে, সেটি সাধারণ মানুষের বোঝার বাইরে চলে যাওয়া ছিল স্বাভাবিক। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে তাঁর জনসভায় আগত ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাদের মধ্যে সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি। বক্তৃতার বিষয় ও উপস্থাপনার আলোকে বঙ্গবন্ধু ধরতে চেয়েছেন তাদেরই আবেগ এবং স্থান চেয়েছেন হৃদয়ের মণিকোঠায়। পেরেওছেন। আর এভাবেই ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি স্বদেশের মাটি ও মানুষের আবেগকে ধারণ করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে।

মুজিবের হলদে পাখি

সেলিনা হোসেন

জেলখানার যে ওয়ার্ডে আছি, সেটার নাম সিভিল ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডের সামনের মাঠটি আমার খুব পছন্দের। মাঠে কয়েকটি আম গাছ আছে। সেখানে আমি ফুল গাছ লাগিয়ে বাগান করেছি। সব মিলিয়ে এই মাঠ আমার টুঙ্গিপাড়ার স্মৃতির দুয়ার। একদৌড়ে ঢুকে গেলে বুকভরে শ্বাস টানা যায়। বুঝতে পারি আমি যেখানে যাই টুঙ্গিপাড়া আমার সঙ্গে থাকে। টুঙ্গিপাড়া আমার মানস-ভূমি। আনন্দ-বেদনার সঙ্গী।

আমার সেল থেকে চল্লিশ হাত দূরের পুরানো চল্লিশ সেলটি পাগলা গারদ। যেখানে দিনেরবেলায় সত্তর জন, রাতেরবেলায় সাঁইত্রিশ জন পাগল থাকে। কয়েকদিন ধরে ওরা রাতে খুব উৎপাত শুরু করেছে। এমন চিৎকার করে যে রাতে আমি ঠিকমতো ঘুমুতে পারি না। ওদের চিৎকারে মাথা ঝনঝন করলে ঘুম আসে না। উঠে বসে থাকি। ঘরে পায়চারি করি। আমি তো দিনের বেলা ঘুমাই না। সেজন্য রাতের ঘুম আমার জন্য খুব জরুরি। ওদের চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে যাই। কিন্তু কিছু করার থাকে না। ওদের থামানোর কোনো দায় জেল কর্তৃপক্ষের নাই। নিজেকেই এই দায় নিয়ে সময় কাটাতে হয়। উপায়হীন দিন কাটে। আমি আমার দিন কাটানো সুষ্ঠু-সুন্দর করার জন্য উপায় খুঁজি। প্রকৃতি আমার এই উপায়ের একটি বড়ো দিক। রাতে ঘুমুতে না পারলে আমি সকালে উঠে ফুলবাগানে হাঁটি। ফুলের দিকে তাকালে ফুলের নানা রং আমার চোখ জুড়িয়ে দেয়। আর ভেসে আসা সৌরভ শ্বাস টেনে বুক ভরে নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় এখানে থাকব না। কিন্তু এমন প্রাকৃতিক সুষমা আমার কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। ভোরের দুঃখ মুছে নিয়ে উড়ে যায়। ভাবি, মানুষের ভালোবাসার ঊর্ধ্বে এ এক অন্যরকম ভালোবাসা পাওয়া। টুঙ্গিপাড়ায় আমার শৈশব থেকে আমি প্রকৃতির কাছ থেকে এই ভালোবাসা পেয়েছি। আমি চেয়ার এনে আম গাছের নিচে বসে খবরের কাগজ কিংবা বই পড়ি। গাছতলায় বসে থাকার এই সময় দারুণ কাটে।

সাত দিন ধরে দেখছি আম গাছটায় দুটো হলদে পাখি রোজ এসে বসে। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। পাখি দুটোকে খুব ভালোবাসি। দুজনে এক হয়ে খেলে। এ-ডালে ও-ডালে লাফায়। পাখা ঝাপটায়। ঠোঁটে ঠোঁট মেলায় আবার পাখা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকে। আমি তাকিয়ে থাকি এমন দৃশ্যের দিকে। পুরোটা আমার সামনে ছবি হয়ে যায়। মনে হয় এ ছবি আমার চোখের সামনে থেকে কোনো দিন ম্লান হবে না।

এখন ১৯৬৬ সালে আমার সময় পার হচ্ছে। ১৯৫৮ সালে যখন জেলে ছিলাম তখনও দুটো হলদে পাখি আসত। সে সময় আমি পাখি দুটোর নাম দিয়েছিলাম খোকা আর

রেণু। আমার সামনে ওরা দশ বছরের খোকা আর তিন বছরের রেণু। জোড় বেঁধেছে। আম গাছের ডাল ওদের টুঙ্গিপাড়া। ওরা কিচকিচ শব্দে ডাকলে আমি বলি, তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি রেণু। তুমি আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। তিন বছরের মানুষটি তুমি আমার পরাণ পাখি।

রেণু হেসে নিজেকে উজাড় করত। জেলে আমার সঙ্গে দেখা হলে বলতাম, তুমি আমার হলদে পাখি। আমি তোমার কে?

–তুমিও আমার হলদে পাখি।

১৯৫৮ থেকে ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পাখি দুটো প্রতিদিন আসত। যেন বলত, আমাদের দেখ। জেলখানায় একা থাকার কষ্ট ভুলে যাও।

–মাঝে মাঝে আমার যে খুব নিঃসঙ্গ লাগে রেণু।

–নিঃসঙ্গতা মেনে নাও। তুমি পুরো জাতির সামনে দাঁড়িয়ে আছ গো।

আমি রেণুর দিকে তাকিয়ে থাকি। কত সহজভাবে এমন একটি গভীর কথা রেণু আমাকে বলল। ও আমার সামনে পুরো দেশ হয়ে লক্ষ মানুষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও রেণুর কোনো দ্বিধা নাই। ওহ আল্লাহ, ও আমার জীবন ভরিয়ে রেখেছে।

এবার জেলে এসে হলদে পাখি দুটোকে খুঁজতে থাকি। একদিন আম গাছের ডালে দুটো হলদে পাখি দেখি। দেখেই বুঝতে পারি এ দুটো আমার আগের দেখা পাখি না। এ দুটো অন্য পাখি। আগের পাখি দুটোর চেয়ে ছোটো মনে হয়। আমি দুচোখ মেলে তাকিয়ে থাকি। একলা ঘরে নিঃসঙ্গ থাকার যন্ত্রণা কমে যায়। একদিন মনে হয় হলদে পাখি দুটো আগের পাখির বংশধর। ভাবনার পাশাপাশি জোরে জোরে হাসি। পাখির বংশধর ভেবে আমি পাখি ভালোবাসার নিজের মনোজগতে স্বস্তি খুঁজি। এমন ভাবনায় তাড়িত হয়ে আম গাছের নিচে এসে দাঁড়াই। ঘাড় ঘুরিয়ে উপরে তাকাই। ডাল-পাতার বিস্তারের সবুজ স্নিগ্ধতায় আপ্লুত হই। আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। দেখি পাখি দুটো পাশাপাশি নিশ্চুপ বসে আছে। আমি বিড়বিড়িয়ে বলি, নিশ্চুপ থাকবি কেন তোরা, গান কর। তোদের গান শুনলে আমার বুকের ভেতর স্বপ্ন ঘনায়। তোরা আমার দুঃখী মানুষ না। তোদের গানে পুরো দেশ আমার সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মনে হয় হলুদ দেশ আমার। হলদে রং সবুজের মাঝে শস্যের স্বপ্ন।

–রেণু পাখি দুটো যে আমার কত বড়ো বন্ধু যারা জেলখানায় একাকী ঘরে বন্দি থাকে নাই তারা বুঝতে পারবে না।

–আমি বুঝতে পারি গো। হলদে পাখি তোমার মনের আনন্দ। তাই না? -ঠিক বলেছ। হলদে পাখি ছাড়াও চড়ুই পাখি আর কাকও আমার বন্ধু।

আমি এই নির্জন ঘরে ওদের নিয়ে আসি ভাবনার তুমুল আনন্দে। আমার ঘরের সামনের বারান্দায় কয়েকটা কবুতর থাকে। এখানে বাচ্চা ফোটায়। তখন বত্রিশ নম্বর

বাড়ির ছবি আমার সামনে ফুটে ওঠে। আমার ভালোবাসার কবুতর হয়ে ওরা আমার আদর পায়। আমি কাউকে ওদেরকে ধরতে দেই না। সিপাহি, জমাদার সাহেবরাও কবুতরগুলোকে কিছু বলে না। বাচ্চাগুলোও নিয়ে যায় না। ওগুলো বড় হয়ে উড়ে যায়। তবে এটা ঠিক আমি কাকের কাছে পরাজিত হয়েছি। রেণু দেখা করতে এলে ওকে যখন একথা বলি, তখন ও হাসতে থাকে। অল্প সময়ে ওর হাসি থামে না। হাসতে হাসতে বলে, পাখির কাছে পরাজিত হওয়া আনন্দের।

–নাগো। কোনো কোনো সময় আনন্দের হয় না।

– কী করে কাকেরা?

–পায়খানা করে আমার ফুল বাগান নষ্ট করে। আর এত চিৎকার করে যে সহ্য করা কঠিন।

–এখন তাহলে তুমি কী করবে?

–আমি ঠিক করেছি যে কাকদের এখানে বাসা বানাতে দেব না। আর আগের বানানো বাসাগুলো ভেঙে ফেলতে বলব কাদেরকে। ওদের চিৎকারে

আমার শান্তি নষ্ট হয়। আমি স্বস্তি হারাই।

–ঠিক আছে ওদের বাসা ভেঙে ফেললে ওরা অন্য গাছে গিয়ে বাসা

বানাবে। অসুবিধা কী?

–হ্যাঁ, বাসাতো ওদের বানাতেই হবে।

–তা ঠিক। ডিম পাড়বে, বাচ্চা ফোটাবে। বাসা না থাকলে ওদের

অধিকার নষ্ট হবে।

–ঠিক বলেছ রেণু।

–তোমার কাছ থেকেই তো মানুষের অধিকারের বিষয় শিখেছি। তুমি আমার টিচার।

–না, না আমি তোমার টিচার না। আমি ঘরে-বাইরে তোমার ভালোবাসার মানুষ।

রেণু মুখ টিপে হাসে। যাওয়ার সময় বলে, তোমার প্রিয় কৈ মাছ এনেছি। পেট ভরে ভাত খেয়ে ঘুমুবে।

–আচ্ছা তাই করব। ঘুমের স্বপ্নে তুমি থাকবে। দেখব টুঙ্গিপাড়ার মধুমতী নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছো। আমাকে নৌকায় আসতে দেখে হাত নাড়ছ। তোমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে অনেক পাখি।

–পাখি, পাখি। তোমার সামনে এখন অনেক পাখি। তুমি আমার হলদে পাখি।

আমাকে হাসতে দেখে রেণু মুখ আড়াল করে। জেলখানার গেটের ঘরে বসে এসব আলোচনায় অন্যরকম আমেজ পাই। রেণুও খুশি হয়। পরে একসময় বিদায় নিতে হয়।

আমি ফিরে আসি নিজের ঘরে। শুনতে পাই কাকদের ডাকাডাকি। নতুন বাসা বানিয়েছে দুটি কাক। দাঁড়িয়ে থেকে দেখি। লোহার তার দিয়ে খুব সুন্দরভাবে গাছের সঙ্গে পেঁচিয়ে ওরা বাসা বানায়। আমার মনে হয় ওরা এক একজন দক্ষ কারিগর। বাসা বানানোর জন্য এইসব উপকরণ কাকরা কোথায় খুঁজে পায় তা ভেবে আমি বিস্মিত হই। পাঁচটা আম গাছ থেকে কাদের মিয়াকে দিয়ে পাঁচ-সাত বার বাসা ভেঙে ফেলেছি। ওরা আবার তৈরি করে। ওদের সঙ্গে আমি সন্ধি করি। ওদের ধৈর্য আর অধ্যবসায় আমার কাছে উদাহরণ হয়ে থাকে। সেজন্য তিনটা আম গাছ ওদের বাসা করার জন্য ছেড়ে দেই। কাকেরা বাসা বানাল। নানা উপকরণ জোগাড় করে বাসা বানায়। তিনটি গাছ ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওরা আর একটি দখল করে ফেলল।

কাদের মিয়া এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, স্যার কী করব? আবার ভাঙব বাসাগুলো?

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করি। দেখতে পাই ওর চেহারায় আশঙ্কার ছাপ। আমি কাদেরকে বলি, না বাসা আর ভাঙতে হবে না। বাসা করতে দাও। এখন ওদের ডিম পাড়ার সময়। ওরা যাবে কোথায়?

–স্যার, আপনি ওদেরকে অনেক মায়া করছেন।

–মায়া তো করব রে। ওদেরও তো ভালো থাকার অধিকার আছে।

–অধিকার কী স্যার? ওরা তো মানুষ না।

–তুই কি বলিস? ওদেরকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আমি কি কাজটি ভুল করছি ওদের বেঁচে থাকার কথা বলে?

–না, না স্যার আপনি ভুল করবেন কেন? আমি ভুল বলছি। মাফ করবেন স্যার। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি স্যার। আপনি আমাদের মাথার উপরের মানুষ। আমাদের ভালোর জন্য আপনি রাজনীতি করেন।

–হয়েছে, হয়েছে থাম।

–থামব কেন স্যার? আমি তো মিথ্যা কথা বলছি না। আপনাকে জেলে পেয়ে আমি খুশি। নইলে তো আপনাকে আমি কাছ থেকে দেখতে পেতাম না। আপনার যত্ন করতে পারতাম না স্যার। আপনার সঙ্গে থাকতে পেরে জেলখানার চাকরি করার জীবন ধন্য।

–বাব্বা, তুই তো দেখছি অনেক বাহাদুর ছেলে রে।

কথা শেষ করে কাদের মিয়া আমার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। আমি ওর মাথায় হাত রেখে বলি, তোর ভালোবাসা পেয়ে আমিও ধন্য রে কাদের মিয়া। যা, তুই অন্য কাজে চলে যা।

–আপনার কিছু লাগবে?

–না, আমার কিছু দরকার নাই। জেলখানার পাখিগুলো আমাকে মাতিয়ে রাখে। হলদে পাখি দুটো আমাকে সঙ্গ দেয়।

–যাই স্যার।

কাদের হাসতে হাসতে চলে যায়।

আমি ঘরে ঢুকি। বিছানায় পা গুটিয়ে বসে খবরের কাগজ পড়ি। কিন্তু কাগজের পাতায় মন বসে না। কেবলই দরজার দিকে তাকাই। কেউ যদি এসে বলে, স্যার আপনার 'দেখা' এসেছে। আমি বুঝে যাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে রেণু এসেছে।

জেলখানায় এরা 'দেখা' শব্দ চালু করেছে। সবাই ব্যবহার করে। 'দেখা' শব্দ বললেই বুঝে যাই যে কেউ এসেছে দেখা করতে। জেল গেটের কাছের ঘরে অপেক্ষা করছে। কাগজ ভাঁজ করে বিছানায় রেখে দিয়ে ভাবি আজ যদি রেণু আসত! সময়টা আমার আনন্দে কাটত। ছোট্ট রাসেলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতাম, সোনারে। গত দিন যখন কোলে নিয়েছি তখন আব্বা, আব্বা করে কয়েকবার ডেকে মায়ের কোলে গিয়ে তাকেও আব্বা, আব্বা বলে ডাকতে শুরু করল।

আমি রেণুকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী?

রেণু বলল, বাড়িতে আব্বা আব্বা করে কাঁদে। তাই ওকে বলেছি, আমাকে আব্বা বলে ডাক। সেদিন ও আব্বা আব্বা করে পরে যখন ডাকতে শুরু করল যেই আমি জবাব দেই ও সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি আমার আব্বা। আমি বুঝতে পারি আমার উপর ওর অভিমান হয়েছে। আগে রেণুর সঙ্গে জেলখানায় এলে আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইত। বলত, আব্বা বাড়ি চল। এখন আর চলে যাওয়ার সময় আমাকে নিয়ে যেতে চায় না।

ওর অভিমানে আমি কষ্ট পাই। মাথা কাত করে বালিশে শুয়ে পড়লে আমার বুক ভেঙে যায়। দুহাতে চোখের পানি মুছি। ছোট্ট শিশুটির অভিমানী চেহারা দুচোখ বুজে থাকলে আমার মানসপটে ভেসে ওঠে। আমি শুয়েই থাকি। ঘণ্টাখানেক পরে দরজায় কড়া নাড়ে কেউ। উঠে দরজা খুলি।

–আপনার 'দেখা' এসেছে স্যার।

–ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।

জেলগেটে এসে দাঁড়ালেই ছুটে আসে হাসিনা আর রেহানা। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, আব্বা আব্বা আপনি কেমন আছেন?

–শরীর ভালোই আছে।

দুজনে আমার দুহাত ধরে রাখে। আমি সাক্ষাৎপ্রার্থীর রুমে ঢুকি। রাসেল রেণুর গলা জড়িয়ে ধরে আছে। আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে হাসে। মুখে কিছু বলে না।

হাসিনা রাসেলকে টেনে ধরে বলে, চল আমরা একটু বাইরে যাই।

–না, আমি যাব না।

–আমরা তোর সঙ্গে খেলব। আয়।

–হ্যাঁ, হ্যাঁ খেলব। চল, চল।

তিনজনে বেরিয়ে যায়।

আমি রেণুর দিকে তাকিয়ে বলি, কেমন আছ হলদে পাখি?

–তোমার হলদে পাখি আজ আম গাছে এসেছিল?

–হ্যাঁ, এসেছিল।

–তাহলেই তো তোমার মন রসে টইটুম্বুর হয়ে আছে।

–থাকবেই তো। তিন বছর বয়সে তুমি আমার হলদে পাখি হয়ে টুকটুক শিস বাজিয়েছ।

–ভালোই বলেছ। এখন তোমার কাকদের কথা বল। ওগুলো কি তোমাকে বিরক্ত করে?

–হ্যাঁ, তা করে। মাঝে মাঝে সহ্য করে থাকি। তবে ওদের একটি ঘটনার কথা আজ তোমাকে বলব। হলদে পাখি আমার ভালোবাসার পাখি।

কাকেরা আমার রাজনীতির পাখি।

–ওহ তাই! রেণু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

–কাকেরা বাসা ভেঙে দেয়ার সময় ভয় পেয়ে একটু দূরে চলে যেত। সেখানে বসে সঙ্গী-সাথি জোগাড় করে চিৎকার করত। আমি বুঝতাম এটা ওদের প্রতিবাদ। ওরা যে এক হয়ে প্রতিবাদ করত এটা আমি খুব প্রশংসা করতাম। অধিকার রক্ষার জন্য পাখিদেরও প্রতিবাদ আছে। আমি বড়ো করে নিঃশ্বাস টানতাম। আমার ভাবনা এলোমেলো হতো না। মনে করতাম বাঙালিদের চেয়েও ওদের একতা বেশি। বাঙালি একতাবদ্ধ হয়ে যদি কাকদের মতো শোষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত তবে তারাও জয়লাভ করত। তাই কাকের অধ্যবসায়ের কাছে আমি পরাজিত হয়েছি। কিছুদিন ধরে কাকরা আমাকে দেখলেই চিৎকার করত। প্রতিবাদের ভাষায় পাখা ঝাপটাত। এখন আর আমাকে দেখলে চিৎকার করে প্রতিবাদ করে না। আর নিন্দা প্রস্তাবও পাশ করে না।

–ভালোই বলেছ, নিন্দা প্রস্তাব পাশ করে না। রেণু দুরন্ত হাসিতে মেতে ওঠে।

–এটাই আমার রাজনীতি রেণু।

রেণু হাসতে হাসতে বলে, বুঝেছি বুঝেছি। পাখিদের নিয়ে ভালোই আসর জমিয়েছ। তোমার আর একা থাকার খারাপ লাগা থাকবে না।

–থাকবে গো থাকবে। তুমি তো আমার কাছে নেই।

–কেন? আমি তো তোমার হলদে পাখি।

আমি মৃদু হেসে চুপ করে থাকি। ছেলেমেয়েরা ঘরে আসে ওদের সঙ্গে কথা বলি। একসময় চলে যায় ওরা।

রাত্রে পাগলের চিৎকারে ঠিকমতো ঘুমুতে পারি না। ভোরে নাস্তা খেয়ে চেয়ার নিয়ে আম গাছের নিচে বসি। হাতে থাকে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' বই। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাই, হলদে পাখি দুটো এসে আমার দুই ঘাড়ে বসে। আমি নড়াচড়া না করে চুপচাপ বসে থাকি। আমি বলি, আয় কাছে আয় ভালোবাসার বন্ধুরা। মুহূর্ত সময় মাত্র উড়ে যায় ওরা। হয়তো ভয় পেয়েছে, আমি যদি ধরে ফেলি। মনে মনে ভাবি ওরা যেন আবার আসে। ভালোবেসে একবার কাছে এসেছে, আবার উড়ে গেছে। বুঝতে পারি এটা ওদের একরকম খেলা। আমারও আনন্দ। বুকের ভেতর খুশির আমেজ নিয়ে বসে থাকা।

একটু পরে দেখি কুড়ি-পঁচিশটা কাক আমার ফুল বাগানে এসে নামে। জড়ো হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রতিটি কাকের দৃষ্টি একই দিকে। আমিও তাকিয়ে থাকি। একসময় ওরা উড়ে চলে যায়। আমি দুহাত নেড়ে বলি, আবার আসিস একতার বন্ধুরা। তোদেরকে আমার পাশে চাই। তোরা একসঙ্গে ডেকে আমার মন ভরিয়ে দিবি।

ওরা চলে গেলে বাগানে আসে হলদে পাখি দুটো। এখন ওরা ফুলের সঙ্গে মিশে থাকে। রংবেরঙের ফুলের মাঝে ওদেরকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। নিঃসঙ্গতার মুহূর্ত আমার সামনে থেকে মুছে যায়। আমি ডেকে বলি, আয় কাছে আয় আমার ভালোবাসা। পাখি দুটো ডানা মেলে দিয়ে ফুল গাছের মাঝে ঘুরে বেড়ায়। একসময় বাগান ছেড়ে আমার কাছাকাছি এসে উড়তে শুরু করে। বাগানের চারদিকে ওড়ে। দূরে চলে যায় না। আমার বুকের ভেতর শব্দ হয় রেণু, রেণু! তুমি আমার হলদে পাখি।

স্বপ্না

আনোয়ারা সৈয়দ হক

স্বপ্না জানে তাকে বাদ দিয়ে বাসার আর সকলে ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে যাবে। স্বপ্না হাজার ইচ্ছে হলেও এই জনসভায় যেতে পারবে না!

কিন্তু মাত্র দু'বছর আগেই যদি এরকমের কোনো ঘটনা ঘটত তো স্বপ্না তাদের বাড়ির ভাই চাচা বাবা ও মায়ের সঙ্গে বা বন্ধুদের সঙ্গে হলেও যেতে পারত। সে ছিল তখন মুক্ত স্বাধীন! আর এখন সে কীভাবে যেন নিজের অজান্তেই পরাধীন হয়ে গেছে!
কেন এরকম হলো?
বড়োভাই মুকিত স্বপ্নার চেহারা দেখে বলল, তুই যেতে চাস?
স্বপ্না যদিও জানে তার ভাই কী বলছে তবু বলল, কোথায়?
মুকিত বলল, কেন , বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে।

স্বপ্না বলল, যেতে তো অবশ্যই চাই ভাইয়া, কিন্তু তোমরাই তো আমার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছ।

আমি কি এ দেশের নাগরিক না? অথচ আমি মেডিকেল থেকে পাশ করে আর্মিতে ডাক্তার হয়ে ঢোকার আগে যখন চিন্তা করছিলাম তখন তোমরা আমাকে কত উৎসাহ দিলে। বললে, যা, পাকিস্তান আর্মি মেডিকেল কোরে যোগ দে। অনেক টাকার স্যালারি পাবি। ভালো রেশন পাবি। আবার থাকবার জন্য কোয়ার্টার পাবি।

একটু থেমে স্বপ্না আবার বলল,আর মাহফুজও বিদেশ যাওয়ার আগে বলল, যাও, আর্মিতেই জয়েন করো। আমাদের বেশ কয়েকটা বন্ধু তো এর আগে যোগ দিয়েছে। তারা তো বেশ ভালোই আছে। নিশ্চিন্ত মনে আছে। আমিও ফিরে এসে আর্মিতেই যোগ দেবো।

মুকিত বলল, আরে, তখন তো সব ঠিকই ছিল। সত্তরের নির্বাচন হবে, দেশে বেসামরিক সরকার আসবে, পাকিস্তানের জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে ইয়াহিয়া, কত ধরনের কথা। এখন এতসব ছলচাতুরী। আমরা কী করে বুঝব বল দেখি?
ভাইয়ের কথা শুনে স্বপ্না গুম হয়ে বসে থাকল।
কথাটা তো সত্যি।
আর স্বপ্নাও কি কম খুশি ছিল? আর্মি কোরে চাকরি নেওয়ার পর থেকেই তার জীবন যেন পাল্টে গিয়েছে। কাজের জায়গায় তার জুনিয়ররা তাকে দেখলেই স্যালুট ঠুকছে। মুখ থেকে কথা না সরতেই প্রয়োজনীয় জিনিস এনে সামনে হাজির করছে। গ্রীন

রোডে সুন্দর একটা ভাড়া বাসা পেয়েছে। বাসা পেতে না পেতে বাসায় টেলিফোন লেগে গেছে। অথচ স্বপ্না এতদিন ধরে শুনে এসেছে, বাড়িতে টেলিফোন পাওয়ার চেয়ে গ্রীনরোডে পাঁচ কাঠা জমি কেনা সহজ।
আবার মাসে মাসে রেশন পাচ্ছে অল্প পয়সায়। তার মা এইসব রেশন দেখে কত যে খুশি। একদিন তো বলেই ফেললেন, ওরে, তোর বাবা এতদিন রেশন শপ থেকে যে সব চাল ডাল কিনে আনতেন, তেল কিনে আনতেন, সব তো দেখি এতদিন দুই নম্বরি ছিল!

আর্মির লোকজনেরা তো দেখি সবচেয়ে ভালো খাবারটা খায়। কোনদিন ভবিষ্যতে যুদ্ধ করবে তার জন্য এত ভালো ভালো রেশন!

মায়ের কথা শুনে স্বপ্না হাসে।

আবার রোজ রোগীদের কাছ থেকেও কত রকমের প্রশংসা শুনছে সে। ডাক্তার হিসেবে নিজকে বেশ ভালো বলে মনে করে স্বপ্না। কারণ সে যাদের হাতে ট্রেনিং পেয়েছে তাঁরা সব পূর্ব পাকিস্তানের নাম করা ডাক্তার। ডাক্তার ফজলে রাব্বি, ডাক্তার ইব্রাহিম, ডাক্তার শামসুদ্দীন, ডাক্তার আসিরুদ্দীন, ডাক্তারি জগতে এঁরা সব একেকজন স্টলওয়ার্থ।

আর্মি মেডিকেল কোরে কাজ করবার বুদ্ধি তো দিয়েছিল তার বন্ধুরাই।

কিন্তু এখন তো দেশের অবস্থা একেবারে অন্যরকম।

সত্তরের নির্বচনে বঙ্গবন্ধুর দলের ল্যান্ডস্লাইড জয় তো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার চোখের ঘুম কেড়ে নিলো। পিপলস্ পার্টির ভুট্টোও বিপদে পড়ে গেল। পাকিস্তানের দুই অংশে দু'জন প্রধানমন্ত্রী থাকবে বলে বায়না ধরল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু অনড়।

নানা টানাপোড়েনে অবশেষে ৩রা মার্চ অধিবেশন বসবে ঘোষণা দিলেন ইয়াহিয়া।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা আশায় বুক বাঁধল এই ভেবে যে যাক এতদিন বাদে একটা সুরাহা হলো। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন এ ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিন্ত হলো।

কিন্তু তা আর হলো না। মার্চের এক তারিখেই প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দিলেন, ৩রা মার্চ ঢাকায় আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখা হলো।

মনে আছে যখন রেডিওতে ঘোষণা দেওয়া হলো তখন স্বপ্না এয়ারফোর্সের মেডিকেল স্কোয়াড্রনে বসে ফ্যামিলি উইং এর শেষ রোগীটা দেখছিল। রোগীটা একটা বাচ্চা ছেলে ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি মায়ের কোলে চড়ে এসেছিল। ছেলে হলেও তার গায়ে ছিল বাচ্চা মেয়েদের ফ্রিল হাতা ফ্রক, চুল মেয়েদের মতো করে মাথার দু'পাশে লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। কপালে লাল টিপ। হাতে সোনার বালা।

রোগী দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল স্বপ্না। বাচ্চাটার বয়স ছিল তিন বছর।
স্বপ্না তার ভুলভাল উর্দুতে জিজ্ঞেস করেছিল, ইয়ে আপকা লেড়কা হ্যায়, মাজি?
মহিলা বলেছিল, জ্বি, ডাগতার সাব।

লেকিন আপ কিউ ইয়ে লেড়কা কো লেড়কি কা ড্রেস প্যানহায়া?
উত্তরে মহিলা একগাল হেসে পান-রাঙানো দাঁত বের করে বলেছিল, 'মেরা ছেলেড়কা হ্যায়, লেকিন মায় তো লেড়কি মাঙতে। আল্লাকো দরবার মে কেতনা বোলা। তো উয়ো তো নেহি শুনা। ফির লেড়কা হোনেসে ম্যায় খাপ্পা হো কর ইনকো লেড়কিকো ড্রেস পেনহাকর রাখতা!

একথা শুনে স্বপ্না হেসে ওঠার বদলে জিব কেটে বলেছিল, 'লেকিন ইনকো তো আইডেন্টিটি ক্রাইসিস হো যায়েগা।'

একথা শুনে মহিলা পান চিবোতে চিবোতে বলেছিল, ও কেয়া হ্যায়?

দুই.

সেদিনই ফ্যামিলি স্কোয়াড্রন থেকে বেরোতে ডাক্তার ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লোকমান বলে ছিলেন, ম্যাডাম, অধিবেশন তো বসছে না।

স্বপ্না তার কথা বুঝতে না পেরে বলেছিল, কোন অধিবেশন?

লোকমান বললেন, ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল না? সেটি এই মাত্র ক্যানসেল করে দিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া।

কথাটা শুনে স্বাভাবিক ভাবেই স্বপ্না বলে উঠেছিল, তাই নাকি?

আর্মি সার্ভিসে রাজনীতির আলোচনা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল স্বপ্না জানত। কিন্তু লেফটেন্যান্ট লোকমান দৃশ্যতই উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, এর ফল ভালো হবে না, ম্যাডাম। শুনছি পুরনো ঢাকায় লোকজন সব রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। স্কুল , কলেজ, অফিস, আদালত, দোকনপাট, যানবহন সব বন্ধ হয়ে গেছে। আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান।

লেফটেন্যান্ট লোকমানের কথা শুনে দৌড়ে এস এম ও সাহেবের রুমে ঢুকেছিল স্বপ্না। দেখেছিল, তিনি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন নিচু গলায় কথা বলছেন। আর প্রতিটি কথার শেষে স্যার, স্যার করছেন। নিশ্চয় স্টেশন কমান্ডারের টেলিফোন।

তাকে দেখে কিছুক্ষণ পর টেলিফোন রেখে বললেন, ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং?

এই সিনিয়র মেডিকেল অফিসারটি বাঙালি, যার বর্তমান র‍্যাংক স্কোয়াড্রন লিডার, আর্মির মেজর র‍্যাংকের সমান, তিনি কখনোই স্বপ্নার সঙ্গে বাংলায় কথা বলেন না। বস্তুত তিনি কোনো বাঙালি অফিসারের সঙ্গেই বাংলায় কথা বলেন না। কিন্তু উর্দুতে বলেন। স্বপ্না মনে মনে এই অফিসারটিকে ভয় পায়।
স্বপ্না বলল, মে আই গো হোম এ বিট আরলি স্যার?
হোয়াই, হোয়াট ফর? এসএমও জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরে কী বলবে বুঝতে না পেরে স্বপ্না বলে বসল, মাই মাদার ওয়াজ নট ফিলিং ওয়েল দিস মরনিং।
মনে মনে বলল, মা, মাফ করে দাও!
এসএমও কথাটা শুনে একটু চুপ থেকে বললেন, ওকে। ইউ মে গো।
সেদিন বাসায় ফিরতে কষ্ট হয়েছিল স্বপ্নার। রাস্তায় একটাও বেবিট্যাক্সি ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে সে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত চলে এসেছিল। তারপর একটা রিকশা পেয়ে ভাড়া দরদাম না করেই উঠে বসেছিল। তার পরনে ছিল ঘিয়ে রঙের এয়ারফোর্সের ইউনিফরম।

সেদিন বাসায় ফেরার পথেই দেখল ফার্মগেট লোকে লোকারণ্য। মিছিল শুরু হয়ে গিয়েছে। স্লোগান উঠছে, জয় বাংলা, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর; তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা; জাগো, জাগো, বাঙালি জাগো।

স্লোগান শুনে স্বপ্নার বুকের মধ্যে যেন ঢেউ ফেনিয়ে উঠল। চেপে রাখা শত শত বছরের চাপা কান্নার শব্দ যেন সে কানে শুনতে পেল। আচ্ছা, বাঙালি হিসাবে সেও তার পূর্ব পুরুষ কত শতাব্দী ধরে শৃঙ্খল বদ্ধ? কত যুগ? কত শত সেঞ্চুরি?

রিকশা গলির ভেতর দিয়ে তার ভাড়া বাসায় পৌঁছল।

বাসায় ফিরে বন্ধু পারুলের টেলিফোন পেয়েছিল স্বপ্না। পারুল পাক্তারি পাশ করে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ চাকরি করে। পারুল বলল, দেখিস, এবার দেশে গৃহযুদ্ধ লেগে যাবে। এইসব সামরিক বহিনীর লোক কি দেশ চালাতে পারে? এদের বুদ্ধি তো মাথায় থাকে না, থাকে ওদের হাঁটুতে।

পারুলের কথাটা গায়ে লেগেছিল স্বপ্নার। সে নিজে মিলিটারি সার্ভিস করছিল বলে কি? জানে না। স্বপ্না বলেছিল, আগে ব্যাপারটা কোনদিকে যায়, দেখেনে।

আর ব্যাপার। সব দেখা হয়ে গেছে। আমার বর বলছে, এবার এই পাকিস্তান ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে!

বাড়ি ফিরতে বাবাকে পেয়ে গিয়েছিল সে। রিটায়ার করবার পর বাবা-মা এখন স্বপ্নার ভাড়া করা বাড়িতে এসে থাকেন। ভাড়াটা অবশ্য এয়ারফোর্সই দেয়। বিদেশ যাওয়ার আগে মাহফুজ ব্যবস্থাটা করে গেছে। স্বপ্নাকে দেখে বাবা বললেন, তাড়াতাড়ি চলে এলি? ভালো করেছিস। ঢাকা তো এখন মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়েছে।

দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে বড়ো ভাই মুকিত বলে উঠল, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ময়দানে তাঁর ভাষণ দেবেন। আমি শুনতে যাবো। ঐদিন একটা ফয়সালা হয়ে যাবে।

শুনে স্বপ্না বলল, আমিও যাবো ভাইয়া। মুকিত ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করে বলল, দরকার নেই, তোর যাবার দরকার নেই। বক্তৃতার দিন ওখানে নিশ্চয় মিলিটারির লোকজন থাকবে। তোকে কেউ চিনে ফেলতে পারে। তখন তোর চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।

দরকার নেই আমার এই চাকরির। কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারে না স্বপ্না। এই চাকরিটা পেয়ে তাদের যে কী লাভ হয়েছে সেটা স্বপ্না বোঝে। বাবা মাকে কত সহজে সে সিএমএইচ এ নিয়ে গিয়ে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাতে পারছে। বাবা তার ডায়াবেটিসের রোগী। মায়ের হার্টের অসুখ। ওষুধ পর্যন্ত কিনতে হয় না। বড়ো ভাই যা রোজগার করে তা তার নিজের সংসার দেখতে শেষ হয়। বাবা খুব কম পেনশন পান। সাভারে একটা জমি আছে সেই জমির কিস্তিও বাবা ঠিকমতো জমা দিতে পারেন না।

তবু স্বপ্না ভাইয়ের কথা শুনে বলল, কেন, আমিও কি একজন দেশবাসী নই? আমি কেন শুনতে পারব না?

মুকিত বলল, সে তখন দেখা যাবে। এখন আমার তাড়া আছে, পল্টন ময়দানের জনসভায় যাচ্ছি। সেখানে তোফায়েল আহমেদ, সিরাজুল আলম খান শ্রমিক নেতারা এরা সব বক্তৃতা করবেন। হঠাৎ করে এই জনসভার ডাক দেওয়া হয়েছে। দেশ এখন উত্তেজনা আর ক্ষোভে ফুঁসছে, আমাকে যেতে বলেছে।

কথা শুনে মা বলে উঠলেন, বাবা, সাবধানে যাস।
শুনে স্বপ্না বলে ওঠে, মা, আমিও দাদার সঙ্গে যাবো?
শুনে মুকিত বলল, তোর কি মাথা খারাপ?

তিন.

আজ ৭ই মার্চ। সকাল থেকে আর গ্রীন রোডে মিছিলের সারি। নানা রকমের ব্যানার ফেস্টুন আর স্লোগানে রাস্তা সয়লাব। স্বপ্না চোখেই দেখছে আজ সকাল থেকে গ্রীন রোডের রাস্তাটা যেন ক্ষোভে ফুঁসছে। সকাল থেকে মিছিল চলেছে একের পর এক। এই সব মিছিল গিয়ে শেষ হবে আজ রেসকোর্স ময়দানে।

এদিকে গত ২রা মার্চ এক সাংঘাতিক উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ছাত্রদের মিটিং শেষে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকার গাঢ় সবুজ পটভূমির ওপর গোল সোনালি বৃত্তের মাঝখানে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র সেলাই করা। দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। টেলিভিশনে দেখেছে স্বপ্না। দেখে তার গা রোমাঞ্চে শিউরে উঠেছে। সে স্টুডেন্ট লাইফে একটু ছাত্র ইউনিয়ন করতো। তাও সিরিয়াস কিছু নয়। চাকরিতে ঢোকার সময় অবশ্য মিথ্যে বলে ঢুকেছে। এরকমের মিথ্যে সকলে বলে। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ তার কোটি কোটি লোকসংখ্যা নিয়ে কীভাবে দিন যাপন করে সেসব কি পশ্চিমের দেশ বোঝে? না। তাদের সে ক্ষমতাই নেই। আর ইচ্ছেও নেই।

দুপুরের রোদ পড়তে না পড়তে বাড়ির সকলে প্রস্তুত হতে লাগল। মা অবশ্য যাবেন না, তার প্রেসার বেড়েছে। বাবা আর মুকিত ভাই যাচ্ছেন। স্বপ্নাকে আগেই বলা হয়েছে এইসব মিটিং এ যোগদান না করতে।

কিন্তু স্বপ্না নাছোড়বান্দা। সে জোর করেই গাড়িত বসল। তার পরনে নীল রঙের শাড়ি। গলাবন্ধ ব্লাউজ। মাথায় ঘোমটা।

মুকিত বিস্মিত হয়ে বলল, এ কি?

স্বপ্না বলল, দেখ ভাইয়া, আজ যদি বঙ্গবন্ধু দেশটা স্বাধীন বলে ঘোষণা দিয়ে দেন তো সেই ঐতিহাসিক সময়ে আমি কি উপস্থিত থাকব না? আর দেশ স্বাধীন ঘোষণা করলে তো আমিও স্বাধীন। আমার আবার কীসের চাকরির মায়া?

স্বপ্নার কথা শুনে ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠলেন বাবা। আর মুকিত বলল, তুই তো দেখি ভীষণ নাছোড়বান্দা। এখন যে যাবি পরে যদি তোর কোনো বিপদ হয়?

ভাইয়ের কথা শুনে গম্ভীর হলো স্বপ্নার মুখ। সে বলল, বিপদ যদি হয়, তখন চিন্তা করা যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে যে কাজ না করলে সারাটা জীবন আফসোস করতে হবে, সেটা কি এখন ভেবে দেখব না? রক্তের ভেতরে আমি যে একজন বাঙালি ভাইয়া। আমার তো আর কোনো পরিচয় নেই।

শত্রুবীজ

মোহিত কামাল

মাটির ঢেলাটি কপালে ঠেকিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন রাজু চৌধুরী। ষাটোর্ধ্ব বয়সে এসে দেশের মাটি কেন কপালে ঠেকাতে হলো জানেন না নিজেই। তবু চৈত্রের রোদ, রোদের ভেতর থেকে বিকীর্ণ রুপালি রোশনি চোখে পুরে আবার মুঠি ভরে তুললেন আরেক দলা মাটি। সূর্যাস্তের সময় যখন রক্তিম চোখ তুলে তাকায় ডুবতে থাকা সূর্য, তেমনি রক্তলাল স্মৃতির ঢাকনা খুলে গেল আচমকা। আর তখনই উদ্দেশ্যবিহীন হাতে তুলে নেওয়া মাটির ঢেলাটা ছুড়ে মারলেন পুকুরে। ঘোলাটে নিথর জলে তরঙ্গ উঠে ছড়িয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই পাড়ের আমগাছের পাতার ঝাড়ের ভেতর থেকে উড়ে গেল কয়েকটি কাক। কাকের রং কালো হলেও গাছ সেজেছে নানা রঙের আল্পনায়–লাল, হলুদ, কমলা আর পাতার সবুজের মহামিলনে চৈত্রের খরতাপের উষ্ণতার মাঝেও প্রাণকাড়া নির্মলতা আর সৌন্দর্যের ছাঁট আটকে গেল চোখের মণিতে। এবার তিনি ডুবে গেলেন স্বপ্নচোখের গভীরে।

কী কারণে যুদ্ধে গিয়েছিলেন ভাবতে গিয়েও নিভে গেল ঘোরলাগা স্বপ্নচোখের আলো। পুত্রবধূ পেছন থেকে ডাক দিয়ে বলল, 'আব্বা, এই খররোদে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছেন? ফুলকথাকে আনতে যাবেন না স্কুলে?'

আজ শুক্রবার। স্কুল বন্ধ থাকার কথা। বন্ধ নেই। লাগাতার অবরোধ আর মাঝে মধ্যে হরতাল ডাকার কারণে বন্ধের দিনও চলছে স্কুল। স্কুলে আনা-নেওয়ার দায়িত্বও পালন করেন তিনি। একমাত্র নাতনি ফুলকথাকে ঘিরেই কাটে সময়। পুত্রবধূর কথা শুনে স্মৃতির উজান ঠেলে ফিরে এলেন বর্তমানে। তারপর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্কুল ছুটির সময় কি হয়ে গেছে?'

'জি। তাই স্মরণ করিয়ে দিলাম আপনাকে। দূর থেকে দেখলাম কেমন যেন বেখেয়ালি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এখানে।'

'না। ভুল দেখোনি তুমি। আজ পত্রিকায় দেখলাম অবরোধের ভয়াবহতা। নিহত হয়েছেন অনেক মানুষ। সঙ্গে পুলিশও। কেউ পেট্রোলবোমা ও আগুনে মারা গেছে, কেউ বন্দুকযুদ্ধ ও গণপিটুনিতে; সংঘর্ষ, সড়ক দুর্ঘটনাও। আর অসংখ্য যানবাহনে আগুন-ভাঙচুর ঘটেছে। এ রকম দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার জন্যই কি একাত্তরে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলাম আমরা? ভেবে কাতর হয়ে গিয়েছিল মন। আনমনা হয়ে স্মৃতির সাগরে খাবি খাচ্ছিলাম। তবে ফুলকথার কথা ভুলিনি। ঠিক সময়ে তাকে নিয়ে আসব। এখন আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সে। তার কথা কি মনে করিয়ে দেওয়া লাগবে আমাকে?'

‘সরি আব্বা। জানি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবু মন মানে না। আজ কেমন যেন একটা টেনশন কাজ করছে মনে। নিরাপত্তাবোধ হারিয়ে গেছে মন থেকে। কী করব বলুন?’

পুত্রবধূকে দোষ দিতে পারলেন না রাজু চৌধুরী। হরতালের কার্যকারিতা হারিয়ে গেলেও প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোনো না কোনো প্রান্ত থেকে খবর আসে পেট্রোলবোমা হামলার। গতকালও চাঁদপুরে পুড়ে অঙ্গার হয়েছেন একজন নিরীহ ট্রাকচালক। এমন চলতে থাকলে তো গোপনে গোপনে মানুষের মনে ভয় ওত পেতে থাকতেই পারে। প্রয়োজনের তাগিদও অস্বীকার করতে পারে না মানুষ। উপরে উপরে সাহসী হলেও ভয় মাথায় নিয়েই বেরোই সবাই। তবে রাস্তায় এলে ভয়টা টের পাওয়া যায় না। এটুকুই সান্ত্বনা। এখনো এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয়নি। বন্ধের দিন এসএসসি পরীক্ষা চলে অধিকাংশ স্কুলে। তবে পড়াশোনা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ফুলকথাদের স্কুলে বন্ধের সময়ও পড়াশোনা চলছে। সমস্যার সামনে নুয়ে পড়েনি ব্যবস্থাপনা পর্ষদ। বিকল্প উপায় বের করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। এরকম বিদঘুটে একটা পরিস্থিতির মখোমুখি হবে দেশ, কখনই ভাবতে পারেননি বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজু চৌধুরী। দেশ স্বাধীন হলেও যে স্বপ্নপূরণ হয়নি সে কথা আর ভুলতে পারছেন না। অসহনশীল সময়ে তাই পুরোনো স্মৃতির ঝাঁপি আবার ঢেকে দিলেন। ফুলকথার স্কুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন পায়ে হেঁটে।

হাঁটতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন পথের ধুলোতেও ফুটে আছে ধুলোচিত্র, ফুলের আকৃতির ধুলোয় পা রাখতে গিয়েও রাখলেন না, খানিকটা সরে দাঁড়ালেন এবার। সড়কের পাশে আমগাছের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কচি সবুজ পাতার ঝাঁকও ভরে গেছে নতুন গজানো হলুদ পাতায়, আর সবুজের ফাঁকে ফাঁকে জেগে উঠেছে তুলতুলে নরম আর হালকা লালচে রঙের নতুন কচিপাতাও। প্রকৃতিতে জোয়ারের মতো ধেয়ে আসছে নবীনের জয়োচ্ছ্বাস। নবীন পাতার নিখাদ নির্মলতা ছুঁয়ে দেখার ভেতরের আগ্রহে হাত বাড়ালেন সড়কের পাশের আমগাছের কচিপাতার ঝাঁকের দিকে। তখনি অন্য একটা ডাল থেকে উড়ে গেল তেলতেলে ডানার কুচকুচে একটা কালো কাক। ওড়ার সময় কা কা শব্দ করল। পুকুরের জলে প্রতিফলিত ছায়া ফেলে উড়ে গেল। একটা উড়লে আর বসে থাকে না সতর্ক চোখের অন্য কাকের ঝাঁক। এখন শব্দহীন উড়ে গেল একটা কাক। আচমকা কেঁপে উঠল শরীর। কেঁপে উঠল মাটি। বুকের চোরা স্রোতে ভয় লুকিয়ে রইল না কেবল, ভয়ের ঢেউ উঠল চোখেমুখেও। আর তখনই দেখলেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি সিএনজি অটোরিকশা। দুঃস্বপ্নের ঝাঁপি আবার খুলে গেল। অটোতে উঠবেন কি উঠবেন না ভাবার সুযোগ পেলেন না রাজু চৌধুরী। ড্রাইভিং সিটে বসা চালক প্রশ্ন করল, ‘আপনি রাজু মুক্তিযোদ্ধা না? রাজু কমান্ডার না?’

বহুদিন পরে তিনি শুনলেন কমান্ডার শব্দটি। কিন্তু বালক চালকের প্রশ্নের মধ্যে শ্রদ্ধা নয়, ওত পেতে আছে যেন তাজা পেট্রোলবোমা। চট করে চিনতে পারলেন বালকটিকে। এই

বালক আর কেউ নয় একাত্তরের তাদের এলাকার শান্তিবাহিনীর প্রধান রহমত আলীর বড়ো ছেলের ঘরের নাতি। একবার এ বালক পথে সন্ধ্যায় নির্জনে দুম করে সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'আপনি নাকি একাত্তর সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েকদিন আগে আমার দাদাজানরে খতম করবার লাগছিলেন?' স্পর্ধাপূর্ণ প্রশ্নটির জবাব দিতে গিয়েও দিতে পারেননি তখন। সামনে তাকিয়ে দেখেছিলেন এককালের উর্বর জমির শস্যহীন খাঁ-খাঁ মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে আছে। নতুন শস্য বোনার জন্য নেই জলধারা। মাটি খোঁজে জল অথচ জল নেই কোথাও। শীতল মাটি নেই কোথাও। পোড়া মাটির গন্ধ ভাসে চারদিক। সোনার বাংলার সোনা ফলানো মৃত্তিকায় পরশ পাওয়ার জন্য মুহূর্তেই মার্চপাস্টের লেফট-রাইট, ডান-বামের মতো বাঁ পা দিয়ে একবার সজোরের আঘাত হেনেছিলেন মাটিতে। ধুলো উড়ে গিয়েছিল চারপাশে। সেই তেজ তখনকার চৈত্রের খররোদের চেয়ে কড়া শাসন ছড়িয়ে দিয়েছিল। সামনে থেকে পালিয়ে গিয়েছিল রহমত আলির নাতি।

'কমান্ডার স্যার, আমি শুনেছি আপনার কারণে ওই সময়ে দাদাজানের জান বাইচ্যা গেছিল। যহন দাদাজানরে এক তরুণ মুক্তি গুলি মারবার লইছিল, তহন আমার বাবজান কোত্থেকে ছুটে আইসা ঝাঁপাইয়া পইড়াছিলেন দাদাজানের ওপরে। আপনার মায়া হইছিল। ছাইড়া দিছিলেন দাদাজানরে। আপনার আদেশে ছাড়া পাইছিলেন তিনি। আমারে এসব কথা কইছেন দাদাজান।'

কমান্ডার রাজু চৌধুরীর ভেতর থেকে এখন কমান্ডারের তেজ ফুঁসে উঠল রহমত আলীর নাতির কথা শুনে। মনে মনে বললেন–ভুল করেছিলাম। ভুল করেছিলাম। ওই সময়ে তোমার দাদাজানের কারণে পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদের গ্রামে ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়েছিল, মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনে সহায়তা করেছিল। তাকে মেরে ফেলাই উচিত ছিল। শত্রুর বীজ রাখা ঠিক হয়নি। ভুল করেছিলাম মায়ার হাতে বন্দি হয়ে। এখন রহমত আলীর প্রজন্ম স্বাধীনতা পক্ষের বিরুদ্ধে ভয়ালরূপে আবির্ভূত হয়েছে। জ্বালা-পোড়াও করছে সর্বত্র।

মনের কথা ঢুকে গেল মনে। চেতিয়ে ওঠা বুক আবার নেতিয়ে গেল রহমত আলীর নাতির এ মূহূর্তের বিগলিত কথা শুনে–'ওডেন আমার অটোয়। আপনার দেরি হইয়া গেল। স্কুল ছুটি হইয়া গেছে। আপনার নাতনি ফুলকথা অপেক্ষা করব। ভয় পাইব। ওডেন তাড়াতাড়ি। আপনার উপকার করতে পারলে খুশি হমু। দেশের অবস্থা ভালা না।'

স্কুলের যাওয়ার সময় অটোরিকশায় ওঠেন না তিনি। ভেবেছিলেন রিকশায় যাবেন। রিকশাও দেখা যাচ্ছে না। ফুলকথাকে স্কুলপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রাখাও ঠিক হবে না ভেবে দ্রুত উঠে বসলেন অটোতে। দ্রুতই স্কুলে পৌঁছে দেখলেন পুরো খালি হয়ে যায়নি স্কুলপ্রাঙ্গণ, ছুটির পর বাসায় ফেরতগামী ছাত্রীরা এখনো মাঠের কোণে জড়ো হয়ে আড্ডা দিচ্ছে। দাদাজানকে দেখে ছুটে এসে ফুলকথা পাশে দাঁড়ানো সিএনজি অটোরিকশা দেখে বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল, 'রিকশায় না এসে, অটোতে এলে কেন?'

রাজু চৌধুরী জবাব দেওয়ার সুযোগ পেলেন না। অটো চালক এবারও নরম ভাষায় বিগলিত ভঙ্গিতেই বলল, 'পথে তার দেরি দেইখ্যা আমিই তুলে আনছি রাস্তা থেইক্যা। রিকশা পাচ্ছিলেন না তো।'

ফুলকথা বলল, 'রিকশায় ফিরব। অটোতে না।'

'খুব মন খারাপ হইল আমার। উপকার করলাম আমি, আর অপমান করলেন আফনি?' বলল অটোচালক।

রাজু চৌধুরী ফুলকথাকে থামিয়ে বললেন, 'থাক না রিকশা। আজ না হয় অটোতেই যাই। সে যেহেতু নিয়ে এসেছে ফিরে গিয়ে একসঙ্গে ভাড়াটা দিব।'

এক পা পিছিয়েও দাঁড়িয়ে রইল ফুলকথা।

রাজু চৌধুরী মৃদু হাসলেন, হেসে উঠে বসলেন সিএনজি অটোরিকশায়। ইশারা করলেন ফুলকথাকেও। দাদাজানের আহ্বান অবহেলা করতে পারল না ফুলকথা। উঠে বসল সেও। আচমকা তার মনে হলো চৈত্রের রঙে রঙিন প্রকৃতির আদর আর সৌন্দর্যের জোয়ারের উল্টো দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। তার কচি মনে বেমানানভাবে হঠাৎ দার্শনিক প্রশ্নের উদয় হলো–শিকড়হীন শিকড়ের দিকেই কি এ যাত্রা? একবার কেবল বলল, 'দাদাজান ভয় করছে, এ সময় সিএনজিতে ওঠা কি ঠিক হলো?'

দুই

অটোরিকশা এগিয়ে চলছে। ফুলকথা দাদার হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'ও তো একটা মাস্তান। তার অটোয় উঠলে কেন, দাদাজান?'

একটা অচেনা আধ্যাত্মিকতায় ডুবে গিয়ে বিমূর্ত জগৎ থেকে মূর্ত জগতে ভেসে উঠে রাজু চৌধুরী জবাব দিলেন, 'মাস্তানদের সিএনজিতে কেউ পেট্রোলবোমা মারার সাহস পাবে না।'

'তবু ভয় করছে।' বলল ফুলকথা।

'ভয়ের কিছু নেই। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়ে গেছে। এখন হয়তো জ্বালা-পোড়াও কমে যাবে।'

'না। তোমার কথায় সাহস পাচ্ছি না। এ এলাকায় তাকে সবাই চণ্ডাল মাস্তান বলে ডাকে। জানো তো তুমি, সে হলো রহমত আলীর নাতি। মুক্তিযোদ্ধা হয়ে রাজাকারের নাতির অটোরিকশায় উঠতে পারলে তুমি?'

নাতনির কথার মধ্যে থেকে বোধের জগতে সাঁই করে আঘাত হানল নতুন বুলেট। এই বুলেটের উদ্বেগদহনকে অচেনা মনে হলো। এমন উৎকণ্ঠার ঝাঁজ কখনো আগে লাগেনি গায়ে। তবু আশ্বস্ত করলেন নাতনিকে। আবারও বললেন, 'ভয় পেয়ো না, ফুলকথা।'

এবার রাজু চৌধুরীর কথাটা কিছুটা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হওয়ায় শুনে ফেলল চণ্ডাল

মাস্তান। আপাতত তার লুকোনো মুখোশের ভেতর থেকে শুদ্ধ ভাষায় বেরোল জোরাল রাজনৈতিক কথার সুর, 'সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হলেই কি সব ঠান্ডা হয়ে যাবে? কী বললেন এটা?'

প্রশ্নটি রাজু চৌধুরীর মাথায় আরেকটা বুলেট হিসেবে আঘাত হানল। সরলভাবে যা তিনি চিন্তা করেন, তার আড়ালেও থাকে আরেক চিন্তা, সঠিক সময়ে সেই ধারণাটা অগ্রিম ধরতে পারেন না তিনি।

উত্তর না পেয়ে চণ্ডাল মাস্তান আবার বলল, 'পেট্রোলবোমা বন্ধ হবে কি হবে না নির্ভর করে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলের ওপর। ফল গুম করলে, কেড়ে নিলে আরও তীব্র হবে পেট্রোলবোমার আক্রমণ।'

শুনে ঘাবড়ে গেল ফুলকথা। চণ্ডাল মাস্তান তো দেখছি কেবল সিএনজিচালিত অটোই চালায় না। রাজনীতিও করে। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে! ভাবলেন রাজু চৌধুরীও। বুঝলেন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষশক্তির অঙ্কুরিত বীজ সুশোভিত হয়েছে, আরও নির্মম আরও ধ্বংসাত্মকরূপে ছড়িয়ে গেছে বর্তমানেও। তবে কি সত্যি সত্যিই একাত্তরে রহমত আলীকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়নি? ইতিহাসের ভুলের বোঝা কি তবে বইতে হবে এখনো?

দাদার হাত আঁকড়ে ধরে বসে আছে ফুলকথা। বিকৃত ভঙ্গিতে সান্তনার স্বরে চণ্ডাল মাস্তান বলল, 'আমার অটোয় কেউ পেট্রোলবোমা মারবে না। এমন সাহস নেই কারুর। তবে জলবোমার ভয়াল ঘূর্ণি আক্রমণ করতে পারে আমাদের। সে ব্যাপারে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নাই আমার হাতে।'

কথাটার অর্থ বুঝল না ফুলকথা। দাদার মুখের দিকে তাকাল প্রশ্নবোধক চোখে। জলবোমার কথা এর আগে শোনেননি রাজু চৌধুরীও। তবে মিছিল ভঙ্গ করার জন্য ঢাকায় জলকামান ব্যবহারের কথা শুনেছেন। এই মফস্বল শহরে কখনো জলকামান দাগানো হয়নি, জলবোমার কথাও শোনেননি কেউ।

জলবোমাটা দেখতে কেমন, কীভাবে বিস্ফোরিত হয় এ অচেনা বোমা, কিছুই জানা নেই ফুলকথার। তবু কল্পচোখে মূর্ত হয়ে উঠল বিমূর্ত জলবোমার উৎসারিত জলাক্রমণ, জলের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে যেন সে চলেছে অজানা কোনো দেশের উদ্দেশ্যে।

তিন

একটা বুনোফুলের গন্ধ নাকে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অটোতে একটা তীব্র ঝাঁকি টের পেলেন পেছনের সিটে বসা বদ্ধ দরজার ভেতর আটকে থাকা রাজু চৌধুরী আর ফুলকথা। কোত্থেকে এলো এ গন্ধ? হঠাৎ দেখা গেল সামনের দরজা খুলে চলন্ত অটো থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়েছে চণ্ডাল মাস্তান। তারপর আর কিছুই দেখলেন না রাজু চৌধুরী, ফুলকথার ভাষাও চুপ হয়ে গেল। সড়কের পাশের বড়ো ঢোবার দিকে নেমে যাচ্ছে সিএনজি অটো। পেছনের সিটের দরজা খোলার কথা ভুলে গেলেন তারা।

বিপদে নিজেদের রক্ষা করার বোধও হারিয়ে ফেললেন। সিএনজি অটো সরসর করে নেমে গেল খাদের গভীর জলে। চকিত ফুলকথার মনে হয়েছিল–পেট্রোলবোমা উড়ে এসে আঘাত হেনেছে অটোতে; দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনশিখায় এসে পড়েছে জলবোমা; জ্বলে ওঠা কল্পিত বারুদের স্ফুলিঙ্গ নিভে গেল মুহূর্তে। বারুদ ভিজে গেল জলে কিন্তু ভেজা বারুদ থেকেও বেরোচ্ছে আগুন। রাজু চৌধুরীর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সে আগুন স্পর্শ করল না শত্রুবীজ চণ্ডাল মাস্তানের বোধের জগৎ। ক্রূরতার আনন্দ নিয়ে একবার চিৎকার করল সে। তারপর খালি সড়কে এগিয়ে আসতে থাকা অন্য একটি অটোরিকশার চালকের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, 'যাত্রীসহ আমার অটো ডুবে গেছে খাদে। আমার অটো উদ্ধার করুন, যাত্রীদের উদ্ধার করুন।'

চেতনার বারুদ ভিজে গেল নবপ্রযুক্তির উদ্ভাবনী এ কৌশল, জলবোমার প্লাবনে। সবাই জানল দুর্ঘটনায় মারা গেছেন রাজু চৌধুরী আর তার ফুলের মতো নাতনি, ফুলকথা।

লেখক পরিচিতি

কবিতা

নির্মলেন্দু গুণ : কবি

মুহম্মদ নূরুল হুদা : কবি ও মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মাসুদুজ্জামান : কবি ও গবেষক

ফারুক মাহমুদ : কবি

বিমল গুহ : কবি

নাসির আহমেদ : কবি, ছড়াকার ও গীতিকার

মোহাম্মদ সাদিক : কবি; প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

মুহাম্মদ সামাদ : কবি; উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আসাদ মান্নান : কবি ও সাবেক সচিব; প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন

আসলাম সানী : কবি, ছড়াকার ও গীতিকার

ঝর্না রহমান : কবি ও কথাসাহিত্যিক

মিনার মনসুর : কবি; পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা

আনিসুল হক : কবি ও কথাসাহিত্যিক; দৈনিক 'প্রথম আলো'র ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মনিরুস সালেহীন : কবি; চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

তারিক সুজাত : কবি; সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় কবিতা পরিষদ

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

শেখ হাসিনা এমপি : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুনতাসীর মামুন : ইতিহাসবিদ; বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক : প্রাক্তন উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী : একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি, প্রাবন্ধিক ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা

সৌমিত্র শেখর : উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

গল্প

সেলিনা হোসেন : বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও সভাপতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আনোয়ারা সৈয়দ হক : কথাসাহিত্যিক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

মোহিত কামাল : কথাসাহিত্যিক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

“এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”